ভয়ঙ্কর
ভূতের গল্প

সম্পাদনায়

লীলা মজুমদার

মহেশ পাবলিকেশন

৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬

আমার কথা

পিলে চমকানো ভূতের গল্পকে আমি সেরা ভূতের গল্প বলি না। যে গল্প পড়লে, বা শুনলে ছেলে-বুড়ো রাতে ছাদে উঠতে কিম্বা মোড়ের মাথায় তালগাছের দিকে তাকাতে ভয় পায়, আমি সে গল্পকে ভালোবাসি না।

ভালো ভূতের গল্প পড়লে বুক দুরু-দুরু করতে পারে, রাতে একা শুতে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা হাওয়া ছাড়া পাওয়া, অনন্তলোকের ইঙ্গিতও পাওয়া চাই। হোক তা হাওয়ার মতো হাল্‌কা মন-গড়া আশ্বাস। তার একটা মজার দিকও থাকে।

ভূতের গল্প যারা ভালবাসে, তাদের আরও ভাল লাগার জন্য এই প্রচেষ্টা সার্থক হলেই আমার আনন্দ।

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

টম সাহেবের বাড়ি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

টম সাহেবের বাড়ি।

প্রকান্ড অট্টালিকা। একতলা, দোতলা, তেতলা, কত যে কামরা তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মেঝেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম আমার ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে, কি আশেপাশে আর দাগ নাই। কেবল সেই একটি দাগ মাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম।

অমনি ঠিক সেই সময় আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি আমার সঙ্গী ভৃত্যের গা টিপিলাম। সেও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই, আগে ধূলার উপর ততই একটি শিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কেবল এক পায়ের চিহ্ন ; দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন আর দাগ পড়িল না।

সেঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। ভৃত্য বাতি জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি যেন হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, বাঃ! একি!

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে। কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। তখন সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়নঘর এই তলায়

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তলায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গী ভৃত্য বলিল — এ কি হইল? এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এইমাত্র চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি এমন সময়ে কি আশ্চর্য, দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। আশঙ্কা যে কি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। নব জীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে, এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ। সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

সে ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথমে দুইজনে দ্বার টানাটানি করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গী বলিল, অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট জোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে।

দুই লাথি নয়, হাজার লাথিতেও সে কপাট ভাঙিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙিতে পারিলাম না। শান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খল্‌খল্‌ করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সেই ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।

সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিটমিট করিয়া কেমন একটি নীলবর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতলায় উঠিতে লাগিল। তেতলার উপরে উঠিয়া একটি সাধারণ শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। যে বৃদ্ধা এই বাড়িতে একাকী বসবাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল ও দুইখানি চিঠি রহিয়াছে। দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম।

মনে হইল, আমার পাশে পাশে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বারবার চেষ্টা করিতেছে। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল

করিলাম। আমার শয়নঘরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ঘড়ি ও পিস্তল টেবিলের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ ছোট একটি ঘরে ভৃত্যকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন একটি পুরুষ তাহার প্রিয়জনকে লিখিয়াছিল, কিন্তু নাম ধাম কাহারও ছিল না। তাহাতে কোন একটি বিভীষিকার আভাস ছিল। কে যেন কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর বসিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীত প্রধান দেশ। ঘরের আগুন জ্বালিবার জায়গায় দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূণ্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিল। হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ধরিতে দৌড়াইলাম। কিন্তু সোঁৎ করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

ভৃত্য এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বলিল — মহাশয়, পলায়ন করুন, পলায়ন করুন! এই স্থানে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপরে, ধরিল রে! এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে দরজা খুলিয়া উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশান সদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম। প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি। কিন্তু বন্ধুবান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম।

আমার সম্মুখে তাল গাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তলটি হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তাহা লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইলাম। অসাড় ও অবশ হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম যদি ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম। বাতি নিবিল না, অগ্নিস্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না। তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলাম।

জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে তালবৃক্ষ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিৎ, লোহিত — নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেমন হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম তাহার নীচে হইতে ঠিক জীবন্ত মানুষের রক্তমাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে গেলাম। খপ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বরাবর সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য!

এথেন্সের শেকল বাঁধা ভূত

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সে অনেক দিন আগের কথা। তখনও যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়নি। আড়াই কি তিন হাজার বছর হবে। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স বলে একটা জায়গা ছিল। এথেন্স কিছু অপরিচিত নাম নয়, সবাই এর নাম শুনেছে। সেই এথেন্সেরই একটা পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রামে এক জঙ্গলের মধ্যে পুরনো একটা বাড়ি ছিল। বাড়িটা অবশ্য অনেক দিন ধরেই খালি পড়েছিল। একে তো নির্জন পাহাড়ি অঞ্চল। তার ওপর বন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা পরিবেশ। তায় পরিত্যক্ত। লোকজনও না থাকলেও বাড়িটা কিন্তু খুব একটা ভাঙ্গা চোরা অবস্থায় ছিল না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে পরিষ্কার করে বা সামান্য সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে লোকে অনায়াসেই সেখানে বসবাস করতে পারত। আসলে সবাই কি আর লোকজনে ঠাসা ভিড় হৈ-হট্টগোলের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করে? অনেকেই নির্জন শান্ত পরিবেশে নিজের মত করে থাকতে ভালবাসে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ বাড়ির যে মালিক সে কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও অনেকদিন পর্যন্ত কাউকে ঐ কুঠিটা ভাড়া দিতে পারেনি। আসলে পাহাড়ের ওপর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কুঠিটার বেশ বদনাম হয়ে গিয়েছিল। একবার এক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক কুঠিটা দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি ছুটির অবকাশ কাটাবার জন্য ঐ নির্জন কুঠিটাকে বেছে নিয়েছিলেন কয়েকদিন শান্তিতে কাটাবেন বলে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল লোকটির মৃতদেহ পড়ে আছে কুঠির দালানে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে যারা তাঁর মৃতদেহ দেখেছিল তাদের মধ্যে কিছু সন্দেহ দানা পাকিয়েছিল। কারণ

মৃত্যুর পরেও লোকটির চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক ভয় লেগে ছিল। আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু, পরে, মানে বেশ কিছুদিন পর আর একজন সৈনিক ধরণের লোক সেই বাড়িতে এসেছিল রাত কাটাতে ঃ লোকটি ছিল অসম্ভব সাহসী। সেই লোকটি প্রাণে মরেনি ঠিকই, কিন্তু তার মুখ থেকে রাত্রির অভিজ্ঞতা যা শোনা গিয়েছিল তা ছিল রীতিমত ভয়াবহ। খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে সবে সে শুতে গিয়েছিল এমন সময় সে হঠাৎ দেখতে পেল ছাই-রঙের দাড়িওয়ালা ইয়া চেহারার বিশাল এক বুড়ো হাতে পায়ে শেকল লাগানো অবস্থায় ঘুমন্ত সৈনিকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখ থেকে কেমন এক ধরণের গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছিল। সৈনিক পুরুষটি মারা যায়নি। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই কুঠি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। সৈনিকটির মুখে সব কথা শোনার পর সারা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি দিনের বেলাতেও আর কোন সাহসী লোক ঐ বাড়ির দিকে পা বাড়াতো না। লোকমুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ার পরই ভূতের বাড়ি বলে কুঠিটার অপবাদ হয়ে গেল। কেউ আর সাহস করে ঐ কুঠির ত্রিসীমানায় পা বাড়াতো না। কুঠির মালিক যে ছিল সে লোকটি কুঠিটা ভাড়া দিয়ে নিজের সংসার চালাতো। কিন্তু যে মুহূর্তে ঐ ধরণের একটা ভূতুড়ে প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল তারপর থেকে আর কেউই কুঠিটা ভাড়া নিয়ে কয়েকদিন থাকার কথা ভাবতেও পারত না। ফলে হল কি কুঠিটা সবার কাছে 'ভূতকুঠি' নামে পরিচিত হয়ে গেল। কেই বা সাধ করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবে? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই জলের দরে কুঠিটা বিক্রি করে দিতে চাইল কুঠির মালিক। কিন্তু কিনবে কে? সখ করে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে কেউ রাজী নয়।

তবু একজন রাজী হল। কুঠির মালিক একজন খদ্দের পেলেন। লোকটি ছিলেন তখনকার দিনে একজন নামকরা দার্শনিক। দার্শনিক মানুষেরা সাধারণত নির্জন জায়াগায় থাকতেই ভালবাসেন। তিনি যুক্তি এবং তর্ক দিয়েই সব কিছু বিচার বা বিশ্লেষণ করতে ভালবাসেন। লোকমুখে কুঠিটার অপবাদের কথা তাঁরও কানে এসেছিল। কিন্তু দার্শনিক ভদ্রলোক মনে প্রাণে কোন অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তিনি ভাবলেন বাড়িটায় গিয়ে তিনি উঠবেন। মানুষের মধ্যে ভূতের ভয়ের অযৌক্তিক সংস্কারকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কুঠির মালিকের কাছে গিয়ে তিনি কুঠিটি কেনার বাসনা জানালেন। মালিক তো হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এমন ভুতুড়ে বাড়ি কোনদিনও ভাড়া বা

বিক্রি হবে না। তাই দার্শনিক ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে মালিক আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কি এই বুড়ো, ভাড়া নয় একেবারে কিনতে চাইছেন? অত্যন্ত কম দামে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুঠিটি বিক্রি করে হাঁফ ছাড়লেন।

আগেই বলেছি যুক্তি ছাড়া দার্শনিক চলেন না। যা চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাকে ছোঁয়া যায় না অথবা অন্তর দিয়ে যাকে উপলব্ধি করা যায় না তেমন কিছুতে তাঁর বিশ্বাস আসবে কেন?

নিজের সব জিনিষপত্তর নিয়ে গিয়ে উঠলেন সদ্য কেনা সেই বাড়িটায়। সারা দিন ধরে নিজের হাতে সব কিছু সাজালেন। নিজের হাতেই তাঁকে সব কিছু করতে হয়েছিল, তার কারণ বাড়িটার ভূতুড়ে কান্ডকারখানা নিয়ে এমন সব গল্পগুজব তৈরী হয়েছিল যে তিনি অনেক বেশী পয়সার লোভ দেখিয়েও কোন চাকর বাকর পাননি।

যাইহোক, সারাদিন পরিশ্রমের পর দার্শনিক ভদ্রলোক বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খুব একটা খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। সামান্য রুটি মাংস আর কফি দিয়ে রাতের আহার শেষ করলেন। তারপর গিয়ে শুলেন তাঁর ছোট্ট বিছানায়। মাথার কাছে বিশাল সেকেলে ধরণের একটা জানালা ছিল। সেটাও খুলে রাখলেন। গরমের দিন। সন্ধ্যে রাতের ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। দেহেও ছিল অত্যন্ত ক্লান্তি। বাতি নিবিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখের পাতায় নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন কে জানে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তির মধ্যে তাঁর ঘুমটা গেল ভেঙে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সামান্য সময় লাগে প্রকৃতিস্থ হতে। দার্শনিক ভদ্রলোকেরও সামান্য সময় লাগলো তিনি কোথায় আছেন, কেমনভাবে আছেন এটুকু বুঝতে। তারপর তাঁর সব কিছু একে একে মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে পড়ল তিনি এসেছেন এক নতুন বাড়িতে। আর এই নতুন বাড়িতেই তাঁর প্রথম রাত্রিবাস। কান খাড়া করে অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তিটা তিনি বোঝার চেষ্টা করতে চাইলেন। মিনিট দুই তিন মড়ার মত বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি বুঝলেন আওয়াজটা অনেকটা শেকলের ঝনঝন আওয়াজের মত। কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। কে যেন অনেক দূর থেকে শেকল টেনে টেনে আসছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। জমাট অন্ধকার সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। মাথার কাছে জানালা দিয়ে কেবল আকাশটুকু দেখা যায়। অবশ্য সেই সময় আকাশটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। আকাশের রঙ আর

ঘরের রঙ এক হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক ভদ্রলোক কিন্তু চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন না। তিনি লক্ষ্য করতে চাইলেন ব্যাপারটা কি? আরও একটা জিনিষ তিনি অনুভব করলেন। সমস্ত ঘরের বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। একটা দম বন্ধ করা গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকটা সময় যখন এইভাবে কেটে গেল, আর জমাট বাঁধা অন্ধকারটা যখন ধীরে ধীরে সয়ে এল, হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন হাতে পায়ে শেকল বাঁধা একটা অশরীরীর হাল্কা ছায়া মূর্তি আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। হাত নেড়ে সেই ছায়ামূর্তিটা কি যেন বলতে চাইছে। মূর্তিটার দুটো চোখ আর মুখের হাঁ থেকে জ্বলন্ত আগুনের আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

দার্শনিক ভদ্রলোক ছিলেন প্রচন্ড সাহসী। ভৌতিক কিছুতে তাঁর তেমন বিশ্বাস বা সংস্কার কিছুই ছিল না। তবু, ভয় না পেলেও, একটা অদ্ভুত বিস্ময় তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল।

তিনি বুঝতে চাইলেন, এটা কি? কোন ভয়ংকর দানব নাকি কোন অসৎ মানুষ ঐভাবে সাজগোজ করে তাঁকে ভয় দেখাতে চাইছে?

শুয়ে শুয়ে এইসব নানান যুক্তি তর্ক যখন তাঁর মনে ঝড় তুলেছে তখনই তিনি দেখলেন সেই হাতে পায়ে শেকল পরা ছায়া ছায়া মূর্তিটা ধীরে ধীরে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তিটা তাঁর একেবারে খাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। দু চোখ আর মুখের গহ্বর থেকে তখনও সেই লাল আগুনের আভাটা ঠিকরে পড়ছিল। সে যেন মুখ হাঁ করে হাত পা নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। আর তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেকলের ঝনঝন আওয়াজটাও ক্রমাগত শব্দ তুলে যাচ্ছিল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেত অথবা দুর্বল হৃদয়ের কোন রোগী হলে নির্ঘাৎ তার মৃত্যু হত। কিন্তু অত্যন্ত সাহসী সেই দার্শনিক ভদ্রলোকটির কিছুই হলো না। বরং তিনি যেমন ছিলেন সেইভাবেই তাকিয়ে রইলেন ছায়ামূর্তিটার দিকে। আসলে তিনি দেখতে চাইছিলেন অশরীরী মূর্তিটি এরপর কি করে?

এক মুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, আর এক মাথা রুক্ষ চুলে মূর্তিটিকে তখন বেশ বীভৎস এবং ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। তার ওপর তার হাতের নখগুলো ছিল বেশ বড় বড়। হাতের তীক্ষ্ণ আর বড় বড় নখ দেখে দার্শনিকের মনে একটা অন্য ধরনের ভয় এল। ভূত তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জ্যান্ত দেহের কোন চোর ডাকাতকে তাঁর ভয় না করার কোন কারণ ছিল না। মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা মানুষের

কতটা ক্ষতি করতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। অদেখা এমন কিছু পৃথিবীতে আছে বলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু জ্যান্ত চোর ডাকাত মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া তাঁর কাছে আত্মরক্ষার মত তেমন কোন অস্ত্রই ছিল না। মনে মনে যখন তিনি ভাবছিলেন সত্যিই যদি লোকটি কোন চোর ডাকাত হয় তাহলে তাঁর করার কিছু থাকবে না। তার ওপর লোকটাকে দেখে মনে হয় তার গায়ে বেশ জোরও আছে। তাই তিনি যখন সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কি করা যায় তাই ভাবছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন মূর্তিটি আর এক পাও না এগিয়ে এসে ক্রমাগত পিছু হঠতে শুরু করল। পিছুতে পিছুতে সে একসময় ঘর পরিত্যাগ করল।

অশরীরী মূর্তিটিকে পিছিয়ে যেতে দেখে দার্শনিক ভদ্রলোকটি ক্ষণিকের অবশ অবস্থা ত্যাগ করে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নিজেও ছুটে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অশরীরী মূর্তিটি ভূত বা অদ্ভুত যাই হোক না কেন দার্শনিক পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন বারান্দা পার হয়ে মূর্তিটি ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল। তারপর লম্বা উঠোনের ঠিক মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎই যেন কর্পূরের মত উধাও হয়ে গেল। দার্শনিক ঠিক তখনই একবার চিৎকার করে উঠলেন 'কে কে' বলে। কিন্তু উত্তরে কেবল অনেক দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট গোঙানী ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না।

উঠোনের ঠিক যে জায়গায় মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে কি যেন ভাবলেন। আরো দু-একবার ডাকাডাকি করেও কারো উত্তর কিছু পেলেন না। বিফল মনোরথে তিনি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। বাকি রাতটা এই অদ্ভুত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করতে করতে কাটিয়ে দিলেন।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রে ঠিক যে জায়গা থেকে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলেন। কিন্তু দিনের আলোয় কোন কিছুই তাঁর অস্বাভাবিক বলে মনে হল না।

পাহাড়ের টিলায় এই বাড়িটি ছিল লোকালয় থেকে বেশ কিছু দূরে। লোকজন কেউ তেমন থাকত না। হয়ত সেটা কুঠি বাড়িকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প এবং গুজব আছে তারই ভয়ে কোন সাহসী পুরুষও এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসত না।

নির্বান্ধব এবং নির্জন বাড়িটায় দার্শনিক আবার তন্ময় হয়ে গেলেন তাঁর নিজের কাজে। নিজের চিন্তায়। নিজের পড়াশুনায়। প্রায় সারাদিনই তিনি বই-এর জগতে ডুবে রইলেন। ফলে রাতের সেই অশরীরী এবং অদ্ভুত ঘটনার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে যখন তিনি বিছানায় শুতে গেলেন তখনই একবার গত রাতের কথা মনে এল। কিন্তু ঘটনাটিকে তিনি তেমন আমল দিলেন না। ভাবলেন অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত থাকার জন্য আধা ঘুম আধা জাগরণে কি দেখতে কি দেখেছিলেন। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম না এলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

ভয়ডর না থাকার জন্যে সমস্ত কিছুকে অলীক বলে উড়িয়ে দিলেও পরের রাতে কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তার পরের রাতেও সেই একই ব্যাপার। পর পর তিন রাত্রি একইভাবে অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব এবং একইভাবে হাত নেড়ে কিছু বলতে চাওয়ার চেষ্টা এবং একইভাবে উঠোনের ঠিক একই জায়গায় এসে মিলিয়ে যাওয়া, তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। তিনি কিছুতেই কোন ব্যাখ্যা দিয়েই বুঝতে পারছিলেন না — এটা কেমন করে হয়? কিভাবে হয়? তবে কি এটা নতুন ধরণের যাদুবিদ্যা? অবশেষে চতুর্থ দিন সকালে দার্শনিক কিন্তু আর নিছকই কল্পনা বলে সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আবার ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেলেন না। তিমি মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু অনুসন্ধানের আছে। নিছক মায়া বা যাদুবিদ্যা নয়। আর সত্যিই যদি অশরীরী কোন প্রেত হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে কিছু বলতে চাইছে। আর সব থেকে দার্শনিককে বেশী আকৃষ্ট করল উঠোনের সেই নির্দিষ্ট স্থানটি। কেনই বা প্রতি রাতে অদ্ভুত এবং বীভৎস আকৃতির সেই মূর্তি ঐ বিশেষ একটি জায়গায় এসে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ঐ জায়গাটিতেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুকিয়ে আছে? এর একটা বিশেষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

চতুর্থ দিন সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক আর বাড়িতে বসে রইলেন না। চলে গেলেন শহরে। প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। অন্য কেউ হলে হয়ত পাগলের খেয়াল ভেবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এই দার্শনিক ছিলেন বেশ নামী লোক। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হিসেবে তিনি প্রায় সকলেরই পরিচিত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মত একজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে যে তিনি মস্করা করবেন না এটা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজেও জানতেন। কালবিলম্ব না করে

তিনি বেশ কিছু মজুর নিয়ে ফিরে এলেন দার্শনিকের কেনা নতুন বাড়িতে। উঠোনের ঠিক যে জায়গায় এসে অশরীরী মূর্তিটি গত তিন রাত্রে অদৃশ্য হয়ে যেত সেই জায়গায় মাটি খোঁড়া শুরু হল। অবশ্য বেশী দূর খুঁড়তে হল না। সামান্য কয়েক হাত জমির নিচেই পাওয়া গেল একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল। কঙ্কালটির হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা। শিকলে মরচে ধরেছে বেশ পুরু হয়ে।

প্রেত বা ভূত কোনদিনও বিশ্বাস ছিল না দার্শনিক ভদ্রলোকটির। কিন্তু গত তিন রাত ধরে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি মূর্তির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালটির কোথায় যেন কি সাদৃশ্য রয়েছে। এটা অনুমান করতে তার কোন অসুবিধা হল না। সহজ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি দিয়ে দার্শনিক এর কোন অর্থই করতে পারলেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পরামর্শে নিয়মকানুন মেনে তাঁরা কঙ্কালটি যথাযথভাবে কবর দিলেন। আর সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার যা, তা হল কঙ্কালটি ভালভাবে কবরস্থ হবার পর আর কিন্তু কোনদিনও কোন রাতেই দার্শনিকের ঘরে সেই অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব ঘটেনি।

এরপর দার্শনিক বহুদিন সেই বাড়িতে বাস করেছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি কবরস্থ কঙ্কালটির সম্বন্ধে খোঁজ খবরও করেছিলেন। কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি ঐ বাড়িতে কাউকে কোনদিনও কবর দেওয়া হয়েছিল কি না। তবে ঐ গ্রামের এক অতি বৃদ্ধের মুখে শোনা যেত, অনেক অনেকদিন আগে এক বৃদ্ধ কৃতদাসকে সামান্য অপরাধের জন্য ঐভাবে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তা জানার উপায় নেই। তবে দার্শনিক এটুকু বুঝেছিলেন মৃত্যুর পর আত্মার আসা যাওয়া থাকে। আর সে আত্মা যদি অতৃপ্ত হয় তাহলে অশরীরী রূপ নিয়ে মানুষকে দেখা দিতে চায়। হয়ত বা তার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির পথ খোঁজে।

দিনে দুপুরে

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্‌চড়্ করে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতোক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোট একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পর মুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখুন আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুশীও — 'কী করে বুঝলে?'

'ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?'

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললো যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় কাতরভাবে আবার বললো, 'চলুন না যাবেন?'

ওসব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলাম না, ট্রামটা

মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটর ঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

'যাবেন তো?'

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'চেতলায় — এই কাছেই।'

'কী হয়েছে, তোমার মা-র?'

'কী হয়েছে, জানি না তো। বড় অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেকদিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো।'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হলো, ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

বললুম, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না —' মেয়েটি আরো কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে ভেবো না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম।

নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয় বন্ধু মহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে মাসে পাই, সেই মাসেই খুব খুশী। এই তো বন্ধুর ছেলের নিরানব্বই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ী ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলো।

হেঁটে রওনা হলুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর কোন ডাক্তার দেখেন নি?'

'ডাক্তার? না। মা বলেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। টাকা পাব কোথায় — '

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়ীতে?'

নাঃ কে আর থাকবে। এক দাদা ছিল আমার সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়লো। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা — এর মধ্যে কেন অসুখ করলো মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরণে হেসে বললুম, 'সে এখন কী করে বলি?'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন — একবার

চোখ মেলে তাকান না। দেখুন বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতদূরে এসেছি, যদি কোন ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোন ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ওষুধের দোকান, ভেতরে পাৎলুন পরা ডাক্তাররা বসে — আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হল আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ী ঃ কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা — ছি, ছি, এটা কী বললুম, আপনারা কেন গরীবের বাড়ীতে খেতে আসবেন ? ডাক্তারবাবু,আপনার দয়া আমি কোনদিন ভুলবো না।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল,

'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে আসতেই মনে হতে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কতো গরীব-দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, না খেয়ে তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই —

পুল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতদূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললো, 'এই তো — আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ী করে নিতুম। ওঃ কতো কষ্ট হল আপনার!'

'বাঃ, এইটুকু হাঁটতে পারবো না!'

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনদিন আর আসিনি। সত্য বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়াগাঁ, পুকুর, বন-জঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ী, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি জীর্ণ শ্যাওলা ধরা খসে পড়া একতলা পাকা বাড়ীর সামনে মেয়েটি এসে বললো, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হয়ে শুয়ে। চোখ তার আধো-বোজা, খানিক পর-পর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকলে, 'মা মা'।

কোন জবাব এলো না।

'মা মা তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো, একখানা হাত বুঝি একটু ওঠাবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটু আওয়াজ হয়তো বেরুলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভাল করে দিন।'

কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার শেষ চেষ্টা করে থাকি:

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভালো হবেন তো?'

'এক্ষুণি আসছি ওষুধ নিয়ে,' বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছিল একটু ঘুরপথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি করে তখন আমি কানে পিঁ পিঁ আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিল না, কে জানে গিয়ে কী দেখবো। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়ীতে এলুম? না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ দুটো সুপারি গাছ। দেড় ঘন্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায়? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেল? ঘরে জিনিষপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যেকটা ছিল, সেকটাই বা কোথায়?

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেল, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেলো কেওড়াতলাতে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কী করে তা হতে পারে? ঘরে কিছু জিনিষপত্র ছিল, একটা লণ্ঠন, দু-একটা থালা-বাটি সেগুলো?

আস্তে আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিষটাই আমার চোখের ভুল ...মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেলো? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইনজেকশন, সব ঠিক আছে না কি আমি পথ ভুল করে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও

নেই। চারিদিকে ছবির মত চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ-বয়সী লোক আমার পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছে। কোনখানে কেউ ছিল না, লোকটা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললো, 'কি মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনার বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসী, জন্মে দুবার চোখে দেখিনি মশাই — সংসারে কেউ কোনখানে নেই আইনের প্যাঁচে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়লো, পিসী যখন স্বগ্গে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হলো। একটা মেয়ে ছিল —' হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বললো, 'ওসব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চললো, ' ঐ তো এক কৌটা বার বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেল, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। একখানাই শাড়ি ছিল পরনে, সেটা দিয়ে কর্ম সারলো। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই। থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিল তিন পুরুষের, একরকম চলে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই — হ্যাঁ ভূত না হাতি। আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, ওসব কথায় কি কান দিতে আছে? নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা — আচ্ছা হরে দরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইল, আপনি ইচ্ছে মত বাড়ি তৈরী করে নেবেন।

অতি ক্ষীণ স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কদ্দিনের কথা এটা?'

'কোনটা? এই পিসীর ... তা দু'বছর হবে। পিসীর জন্যে কোন ভাবনা ছিল না মশাই, মেয়েটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে, পাঁচ টাকাতে কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুনতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরাতেও পারিনে। আমি গরীব মানুষ, আমার ওপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে। আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন ... বলুন না।'

ঠিক দুপুরে আকাশ কুসুম

স্বপন বুড়ো

আজ ক্লাসে ঢুকেই যে টেকো-মাথা পঞ্চানন পন্ডিত একেবারে সরাসরি তার দিকে আঙ্গুল তুলে 'শব্দের রূপ' মুখস্থ বলতে আদেশ করবে সে কথা গজানন জানবে কি করে?

গজানন তো আর জ্যোতিষ বিদ্যা জানে না।

জানলে হয়তো একদিনের জন্য ইস্কুল থেকে পলায়ন করতো।

সারা ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে তাকেই কেন শব্দরূপ বলতে সরাসরি বেছে নেয়া হল, সে কথা গজানন অনেক ভেবে চিন্তেও বুঝে উঠতে পারল না। তার মুখটা কি একেবারে প্যাঁচার মতো?

'নর' শব্দ, 'নদী' শব্দ কোনো কিছুই তার আয়ত্তে নেই।

অবশেষে পঞ্চানন পন্ডিত তাকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে একটা ইঁটের টুকরো কপালে বসিয়ে দিয়ে বললো, এটা যেন কোনো মতেই মাটিতে পড়ে না যায়। পড়লেই বেত যে কেমন মিষ্টি সেটা ভালো করে চেখে দেখতে হবে।

পঞ্চানন পন্ডিত সবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, গজানন কপালের ইঁটটা হাতে তুলে নিয়ে পন্ডিতের পৃষ্ঠদেশের উদ্দেশ্যে হাতের তাক্ করে ছুঁড়ে মারল। তারপর লম্বা লম্বা লাফে ইস্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তখন আর তাকে পায় কে।

সারা ইস্কুলে হৈ-হৈ- রৈ-রৈ শব্দ উঠল।

কিন্তু পঞ্চানন পন্ডিতের হাজার আদেশেও কেউ গজাননকে অনুসরণ করতে রাজি হল না। ওর হাতের অব্যর্থ তাক্ এই খানিকক্ষণ আগে পঞ্চানন পন্ডিত তাঁর পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ অনুভব করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার আগ্রহ গোটা

ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আর কারো ছিল না। কাজেই গজানন পরম আরামে ও আনন্দে নদীর দিকে চলে গেল। ওখানে মাঝিদের নৌকোয় পাল তোলা আছে। একটু দূরে একটা বিরাট ফলের বাগান আছে। আর আছে মৃদু সমীরণ আর মৌমাছিদের গুনগুনানি। সেখানে গজানন নিজেকে অতি সহজেই হারিয়ে ফেলে।

নদীর ধারের অবারিত আনন্দ আর খোলা হাওয়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

মাঝির দল তখন সবাই নিজের নিজের নৌকায় রান্না চাপিয়েছে। ওরা কেউ নৌকায় পাল তুলে দিয়ে নদীর পথে উধাও হয়ে যেতে রাজি হল না।

বিরক্ত হয়ে গজানন নদীর পথ ধরে নির্জন ফলের বাগানের দিকে এগিয়ে চললো। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা সবকিছু বাগান ভর্তি।

এমন মনোরম জায়গা থাকতে ছেলেরা দুপুর বেলা গুমোট ইস্কুল বাড়ীতে বন্ধ থেকে প্যাঁচার মতো মুখ করে শব্দরূপ মুখস্থ করে কেন, সে অনেক ভেবে-চিন্তেও বুঝে উঠতে পারল না।

গাছে গাছে পাকা আম ঝুলে রয়েছে। গজাননের হাতের টিপে দু'একটা টুপটাপ পড়ল তলায়। তাই আমেজ করে চুষতে চুষতে এগিয়ে চললো গজানন। চোখ বুঁজে মিঠে হাওয়ায় পাখীর মিঠে বোল শুনতে শুনতে আপন মনে ভাবলো, আহা এমন মধুর আনন্দে যদি জীবনটা কেটে যায় তাহলে আর কিসের পরোয়া। দূরে পড়ে থাক পঞ্চানন পন্ডিতের বেত, আর শব্দরূপের কচকচি। সারা জীবনের পথ যদি এই ফলের বাগানের ভেতর দিয়ে চলে, তাহলে সে ভ্রমরের মতোই গুনগুন করে পরম আমেজে তুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ গজানন তাকিয়ে দেখে তার উল্টো দিক থেকে এক ফকির লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে আঁকা বাঁকা পথ ধরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ফকিরের পিঠে ঝুলছে একটা ঝোলা। ফকিরের অনেক বয়স হয়েছে। মাথাটা একেবারে নেড়া। সাদা দাড়ি গোঁফ হাওয়ায় দুলছে। আর সেই সঙ্গে দুলছে তার নেড়া মাথা। গজাননকে ঐভাবে একা একা এগিয়ে আসতে দেখে ফকির ফোকলা দাঁতে ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠলো। তারপর মাথা নেড়ে কইলে, হুঁ। বুঝতে পেরেছি। ইস্কুল পালিয়ে এই ফলের বাগানে ঢুকেছ খোকা। কিন্তু সারা জীবন তো এইসব ফল পেকে ঝুলে থাকবে না। তখন রস জুটবে কোথায় শুনি?

গজানন ফকিরের কথা গায়ে মাখল না। সেও খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। কইলে, শোন ফকির ভাই, আমি খোকা নই। আমার নাম গজানন। ইস্কুল থেকে

সরে পড়েছি, একথা সত্যি। এমন মজাদার রসালো বাগান থাকতে — কে আর 'শব্দরূপ' মুখস্থ করে বলো?

তারপর ফকিরের কাছাকাছি এসে আবদারের সুরে কইলে, ফকির ভাই, আমাকে একটা গান শিখিয়ে দেবে?

ফকির মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল। জবাব দিলে, গান আমি তোমায় শেখাতে পারি। তার আগে তোমায় বলতে হবে — আমার এই ঝোলার মধ্যে কি আছে?

ফকিরের কথা শুনে গজানন ভারী মজা পেল। মাথা নেড়ে কইলে, হুঁ! বলতে পারি তোমার ঝোলার ভেতর কি আছে। আচ্ছা, আমায় একটু ভাবতে দাও। তোমার ঝোলার ভেতর রয়েছে রং বেরঙের একটি পিরান, দুটি সরু পায়জামা, একটি গানের খাতা, যাদুর খেলা দেখাবার জন্যে একটি হাড়ের কৌটো।

ফকির হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, হোল না খোকা, হল না। আমার ঝুলি থেকে ঝেড়ে তোমায় সব দেখাচ্ছি। ফকির তার কাঁধ থেকে ঝুলিটা তুলে নিয়ে গজাননের চোখের সামনে উপুর করে ধরল। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পাকা কলা, পাকা লিচু, পাকা আম, আর রাশি রাশি পাকা কালো জাম।

দেখে শুনে গজানন মহাখুশী। কইলে, আচ্ছা ফকির, তুমি কি যাদুর খেলা জানো? আমারও দারুণ খিদে পেয়েছে। আগে তোমার পাকা ফলগুলি খেয়েনি। তারপর গাছের ছায়ায় বসে গান শিখবো। ফকির কিন্তু হাসি মুখে মাথা দোলাতে লাগলো।

উঁহু। সেটি হচ্ছে না খোকাবাবু। আমার আনা পাকা ফল — তুমি যে টপাং করে মুখে পুরে দেবে — সেটি আমি কিছুতেই হতে দেব না। গজানন একবার ফলগুলির দিকে তাকিয়ে চোখ দুটি নামিয়ে কইলে, তোমার ফলগুলি দেখে মনে হচ্ছে — এ বাগানের ফল একটিও নয়। ফকির ভাই, নিশ্চয়ই তুমি যাদুর খেলায় এই মজার ফলগুলি মুহূর্তের মধ্যে আমদানি করেছ। আমায় এইরকম যাদুর খেলা শিখিয়ে দাও না।

ফকির তার নেড়া মাথা দুলিয়ে কইলে, যাদু তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমায় ওই টলটলে পুকুরের জলে একটা ডুব দিয়ে আসতে হবে।

— এ আর বেশী কথা কি?

মহানন্দে তিড়িং মিড়িং লাফাতে লাফাতে গজানন পাশের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফলের বাগান ছেড়ে গজানন এগিয়ে চললো। পথে তার সঙ্গে দেখা হল — ইস্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে।

তারা দু'হাত তুলে গজাননকে কত ডাকতে লাগলঃ

— গজানন, আমাদের সঙ্গে চলে আয়। ইস্কুলে ফিরে যেতে হবে না? আর সাত দিন পরই তো পরীক্ষা শুরু হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে পরীক্ষা দেব। নিশ্চয়ই আমরা পাস করবো।

গজানন বন্ধুদের ডাক শুনলো না, দ্রুতপদে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

ইস্কুলের পড়ুয়ারা চীৎকার করে কইলে, গজানন, অমন করে আমাদের ছেড়ে চলে যাসনে। পঞ্চানন পন্ডিত মশাই তোকে আর কিছু বলবে না। আমরা সবাই মিলে তাঁকে অনুরোধ করবো।

গজানন কিন্তু কারো অনুরোধে কান পাতল না। নিজের গোঁতে এগিয়ে চললো। এইভাবে গজানন বন্ধুদের, অভিভাবকদের, শুভানুধ্যায়ীদের কারো কোন কথা শুনলো না। শিক্ষকরা ওর সম্পর্কে একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

ধীরে ধীরে গজাননের বয়স বেড়ে গেল।

ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে গজানন।

বন্ধুরাও ওকে আর কেউ ডাকে না। একা একা এখানে ওখানে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় গজানন।

গজাননকে কেউ খেলতে ডাকে না। একেবারে জংলী হয়ে গেল গজানন।

কিন্তু পেটের খিদে তো কোনমতেই যাবার নয়।

গজানন কোন বাড়ীতে গিয়ে খাবার চাইলে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এক জায়গায় ভাত চাইতে বাড়ীর লোকে তাকে তেড়ে মারতে আসল। বললে, জোয়ান মরদ ছেলে, খেটে খেতে পারো না? ভাত চাইতে এসেছ? লজ্জা করে না তোমার?

গজানন ভাবলে, ঠিক কথাই তো। ভাত চেয়ে খাবে কেন? সে চাকরী করবে। এক অফিসে গিয়ে গজানন চাকরি চাইলে।

অফিসের বাবুরা বললে, কি লেখাপড়া শিখেছ তুমি? কটা পাস দিয়েছ যে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছ?

গজানন সে কথার কোন উত্তর দিতে পারে না।

অফিসের বাবুরা রসিকতা করে বলে, যা ধাঙড়দের সঙ্গে রাস্তা সাফ করগে—

ভদ্রলোকের ছেলে। গজানন সে কাজ তো করতে চায় না।

তখন সে এক গেরস্ত বাড়ীতে গিয়ে চাকরের কাজে বহাল হল।

দিন-রাত তাকে বাসন মাজতে হয়, ঘর-দোর সাফ করতে হয়। হাজার বার করে বাজারে ছুটতে হয়। ফাই-ফরমাসের অন্ত নেই।

দিনের শেষে কড়কড়ে কাঁকড় মেশানো ঠান্ডা ভাত, কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খায়। সে ভাত মুখে তুলতে পারে না। ওর পেট ভরে না। খাটতে খাটতে গজানন কাহিল হয়ে পড়ল।

আর আগের মতো বাসন মাজতে পারে না।

ঘর-দোর সাফ্ করতে পারে না।

ফাই-ফরমাস খাটতে পারে না। একটুকুতেই হাঁপিয়ে পড়ে। বাড়ীর গিন্নি তখন ওকে তাড়িয়ে দিল।

ঘরতে ঘুরতে গজানন এক দোকানে গিয়ে কাজ নিলে। খাবারের দোকান। সেখানেও উদয়-অস্ত খাটতে হয়।

তবে একটা সুবিধে এই যে, দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেয়। সেই খাবারের দোকানে আরও যেসব ছোকরা কাজ করে তারা সবাই মিলে শলা পরামর্শ করে গভীর রাত্রে খাবার চুরি করে খায়।

ছোকরার দল একদিন বলল, গজানন আমাদের সঙ্গে যদি খাবার চুরি করিস তাহলে তোকেও ভাগ দেব।

গজানন কিন্তু চুরি করতে রাজি হয় না।

দোকানের মালিক দু'বেলা তাকে যে খাবার খেতে দেয় তাতেই সে খুশী।

দোকানের ছোকরাগুলো কিন্তু ভারী শয়তান। তারা যে শুধু নিজেরা দোকান থেকে খাবার চুরি করে খায়, তাই নয়। এই দোকানের খাবার বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে।

তাতেও ছোকরাদের অনেক পয়সা-কড়ি লাভ হয়।

একদিন ছোকরার দল দেখলে, দোকানে অনেক রকম খাবার তৈরি হয়েছে। পরদিন বিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দোকানের মালিক বারবার সাবধান করে গেছে, কোন জিনিষ যেন খোয়া না যায়। সারা রাত জেগে দোকানে পাহারা দিতে বলে গেছে মালিক। সেজন্যে আলাদা বকশিস্ দেয়া হবে, সেকথাও ছোকরাদের জানিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু মালিক বাড়ী চলে যেতেই ছোকরার দল সেই সব খাবার বাইরে চালান

করে দেবে ঠিক করলে। গজাননকে বললে, ওদের সঙ্গে মাল বয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু গজানন কিছুতেই সে কাজ করতে রাজি হল না।

পরদিন দোকানের মালিক খাবারগুলো দেখতে না পেয়ে সবাইকে গালাগাল শুরু করে দিল।

তখন ছোকরার দল এক জোট হয়ে গজাননের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিলে। বললে ওরা যখন সবাই ঘুমুচ্ছিল, তখন গজানন বাইরে থেকে লোক এনে সব খাবার পাচার করে দিয়েছে।

দোকানের মালিক রেগে-মেগে থানা থেকে পুলিশ ডেকে এনে গজাননকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে। পাহারাওলা গজাননের হাতে হাতকড়া পরাতে এলো।

গজানন চীৎকার করে কইলে, আমি চুরি করিনি। আমি চোর নই।

হঠাৎ এমন সময় গজানন ভুস করে পুকুর থেকে মাথা তুলে হাঁফাতে লাগল। দেখলে ফকির পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে তার ন্যাড়া মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে।

গজানন হাঁফাতে হাঁফাতে কইলে, ফকির ভাই, কতক্ষণ আমি পুকুরের জলে ডুব দিয়ে ছিলাম? এসব কি কান্ড ঘটল বলত? সারাটা জীবন কি আমার এমনিভাবে ভিক্ষে করে কাটবে?

ফকির ফোকলা দাঁতে হেসে উঠে উত্তর দিলে, মাত্র দু'মিনিট তুমি পুকুরের জলে ডুব দিয়েছিলে। তাতেই এই সব ভুতুড়ে কান্ড দেখতে পেলে। তোমার জীবনটা সিনেমার মতো তোমার চোখের সামনে দেখতে পেলে তো? এখন বুঝতে পারলে জীবনের পথ পাকা ফলের মতো রসে টুলটুলে নয়? পরিশ্রম করে তোমায় মানুষ হতে হবে।

গজানন মাথা নীচু করে কইলে, ফকির ভাই, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। কালই আমি ইস্কুলে ফিরে যাবো।

হঠাৎ গজানন তাকিয়ে দেখে তার সামনে থেকে ফকির তার ঝুলিঝোলা শুদ্ধ একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

রাক্ষুসে পাথর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু, বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ঐ দ্বীপে যাবেন না। ওখানে দোষ লেগেছে।

আমরা একটু অবাক হলুম। দোষ লেগেছে মানে কী? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে?

বিমান বললো, বুড়ো কর্তা, তুমি যা টাকা চেয়েছো, তাই দিতে আমরা রাজি হয়েছি। তবু তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছো না কেন? ঐ দ্বীপে কি আছে?

বুড়ো মাঝি তার সাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললো, কিছুই নেই। সেই কথাই তো বলছি। শুধু শুধু ওখানে গিয়ে কী করবেন?

বুড়ো মাঝি হাল ধরেছে, আর দাঁড় বাইছে নাতি। এই নাতির বয়স তো চোদ্দ বছর হবে, ওর নাম সুলেমান। সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মাঝি যতই না বলছে, ততই আমাদের জেদ চেপে যাচ্ছে। একটা সাধারণ দ্বীপ, সেখানে কি এমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে? কত জাহাজ যাচ্ছে এখান দিয়ে, সে রকম কিছু থাকলে সবাই জানতে পারত।

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্য এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রি করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা। নৌকো দেখেই আমাদের মনে হলো, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান দু'জনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনো মানুষজন অবশ্য সেখানে এখনো থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ঐ দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখান থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ঐ দ্বীপেও অনেক ঘরবাড়ি হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলবো, জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম তখন এসব কিছুই ছিল না, শুধু গাছপালা আর ... ।

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্য আমি অনুনয় করে বললুম, ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছো?

বুড়ো মাঝি বললো, কিছু নেই তো বলছি গো বাবু, শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি। আর ঐ শামুক ঝিনুক ভাঙা।

বিমান বললো, তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছো না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?

বুড়ো মাঝি বললো, আকাশে মেঘ দ্যাখো না বাবু, এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায় কিনারায় থাকা ভালো।

বিমান বললো, তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছো? সামান্য মেঘ, এতে কখনো ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাওনা তাই বলো!

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, সুলেমান তুমি গেছো সেই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?

সুলেমান দাদুর দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো, ভয়ের কিছু নেইকো। অন্য কিছু দেখা যায় না। তবে সেখানে গেলি মনটা কেমন কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এ তো আরও অদ্ভুত কথা, একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যাবে? আমি আর বিমান দুজনেই হেসে উঠলুম। তা হলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললাম, তুমি যদি না যেতে চাও তো আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকো ভাড়া করবো।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান ভালো করে টান।

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া ছিল। নদীতে বড় বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। এপার ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডান দিকে হাত তুলে বললো, ঐ যে দেখেন, আগুনমারির চর। দেখলেন তো?

আমি আর বিমান দু'জনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হলো নদীর বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝি বললে, দেখা হলো তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, সে কি আমরা কাছে যাবো না!

— কাছে গিয়ে আর কি করবেন? আর তো দেখার কিছু নাই।

বিমান এবারে বেশ রেগে গিয়ে বললো, তোমার মতলব কি বলো তো, বুড়ো কর্তা? ঐ দ্বীপে কি তোমার কোনো জিনিষপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

বুড়ো মাঝি আমতা আমতা করে বললো, দেখা তো হলোই, আরও কাছে গিয়ে লাভটা কী।

বিমান বললো, লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমরা ঐ দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই।

বুড়ো মাঝি এবারে খুব জোরে হাল ঘোরাতেই নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো

বললো, এবারে নামুন।

সেখানটায় অন্তত এক হাঁটু জল। তারপর কাদামাটি। বিমান বললো, আর একটু এগোও, এখানে নামবো কি করে?

বুড়ো মাঝি এবার রাগে গড়গড়িয়ে বললো, আপনাদের বাবু এখানেই নামতে হবে। আমার নৌকো ঐ চরের মাটি ছোঁবে না। ও মাটি অপয়া।

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা এখানেই নামবো।

জুতো খুলে রাখলুম নৌকোয়। তারপর হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়লুম জলে। ছপ ছপ করে এগিয়ে গেলুম দ্বীপটার দিকে। বুড়ো মাঝি নৌকোটাকে আরো গভীর জলের দিকে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে নোঙর ফেলে দিল।

দ্বীপটাতে ছাড়া ছাড়া গাছপালা রয়েছে। তারপর ধূ ধূ করছে বালি। সেই বালিতে কোথাও কোথাও ঘাস হয়েছে। একটা খড়ের চালাঘরও রয়েছে একপাশে। সেই ঘরে কিন্তু কোনো মানুষ নেই।

কাদা মাখা পায়ে ওপরে উঠে আমরা বালিতে পা ঘসে নিলুম। বিমান বললো, একটা কিছু ফ্ল্যাগ নিয়ে এলে হতো। তাহলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা এই দ্বীপটা দখল করে নিতুম।

আমি বললুম, তা কী করে হবে। আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে। দেখছিস না, ঘর রয়েছে।

আমরা ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পাতা আছে একটা খাটিয়া। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর। জায়গাটায় বিচ্ছিরি গন্ধ।

বিমান বললো, এখানে লোকেরা গরু চরাতে আসতো। কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসতো কি করে?

আমি বললুম, বড় বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসতো। আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি।

— তারা এখন আর আসে না কেন?

— বর্ষাকাল এসে গেছে, সেইজন্য এখন আসে না। এতো সোজা কথা।

— দ্বীপটা কী রকম চুপচাপ লক্ষ্য করছিস? কোনো শব্দ নেই।

— মানুষজন নেই, শব্দ হবে কি করে? তবু আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে

পাচ্ছি। কান পেতে শোন।

দু'জনেই চুপ করে দাঁড়ালুম। সত্যি খানিকটা দূরে গাছপালার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছে খুব জোরে। কোনো মানুষ অবশ্য অত জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বিমানের মুখটা শুকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বললো, ওটা কিসের শব্দ বলতো সুনীল? সাপ নাকি?

আমি বললুম, সাপ অত জোরে ফোঁস ফোঁস করে?

— সমুদ্রে বড় বড় অজগর সাপ থাকে শুনেছি। সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে, ঐ জন্যই বোধহয় মাঝিরা এখানে আসতে ভয় পায়।

— একটা অজগর সাপ থাকলে সেটাকে মেরে ফেলতে পারতো না? চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

— সঙ্গে লাঠি ফাঠি কিছু একটা আনলে হতো।

— ভয় পাচ্ছিস কেন, বড় সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।

ডান দিকে খানিকটা দূরে দু'তিনটে বড় বড় গাছের পাশে কিছুটা ঝোপ ঝাড়ের মতন। শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই।

আমরা গুটি গুটি পায়ে এগোলুম সেদিকে। শব্দ মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে আমিই ভয় পেয়ে বিমানের হাত চেপে ধরলাম। ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।

বিমান বললো, ওটা তো একটা মোষ। কাত হয়ে শুয়ে আছে।

এবারে আর একটু এগিয়ে আমরা মোষটার মাথাটা দেখতে পেলাম। দেখলেই বোঝা যায়, মোষটা মরে যাচ্ছে। মোষটার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ওরকম করুণ চোখ আমি কখনো দেখিনি। মোষটা মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন তার পেটটা ফুলে উঠছে। ঐটুকুতেই বোঝা যায় যে ও বেঁচে আছে।

আমি বললুম, এতো বড় একটা মোষ ... কী হয়েছে ওর? সাপে কামড়েছে?

বিমান বললো, অসুস্থ হতে পারে। মোষেরাও তো অসুস্থ হয়।

— কিন্তু কোন লোকজন নেই? একলা একলা একটা মোষ এখানে পড়ে আছে?

— মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে, ও আর বাঁচবে না। সেইজন্য একে

ফেলে রেখে চলে গেছে।

আমরা আর ঝোপটার মধ্যে না ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। যতবার মোষটার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি, ততবার মন খারাপ লাগছে।

বিমান বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, এখানে গাছের পাতাগুলো কেমন যেন শুকনো শুকনো। এখন বর্ষাকালে তো গাছের পাতা শুকিয়ে যায় না।

আমি বললুম, গাছগুলোর ছাল খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধহয় গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।

বিমান বললো, বাজে কথা বলিস না। সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না? সেখানকার জল তো আরও বেশি নোনা। এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা কী রে?

— ওটা তো একটা পাথর।

— আশ্চর্য তো। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

— কিসের আশ্চর্য?

— তুই বুঝলি না? গঙ্গানদীর দ্বীপে পাথর আসবে কি করে?

— কেন?

— এখানে কি কোথাও পাথর আছে? এদিকে কি কোথাও পাহাড় আছে? এখানে এত বড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে?

পাথরটা এমনিতে খুবই সাধারণ। একটা মাঝারি ধরণের আলমারির সাইজের। যে-কোন পাহাড়ী জায়গায় গেলে এরকম পাথরের চাই পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর তো দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আমরা পাথরটার কাছে গেলুম। সেটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। আমি পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। হয়তো গঙ্গার এখানটাতে ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরী হবার সময় পাথরটা উঠে এসেছে।

বিমান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, তোর কি বুদ্ধি! পাথর কি হাল্কা জিনিস যে জলের উপরে ভেসে উঠবে? তাছাড়া দ্যাখ, এর তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে। এই দ্বীপটা হবার পরে কেউ পাথরটা এখানে এনেছে। কিন্তু শুধু শুধু কেন এত বড় একটা পাথরকে এখানে বয়ে আনবে?

আমি পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, উল্কা নয় তো। অনেক

সময় উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে —

বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

বিমান দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো, সুনীল ? কী হলো তোর ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুব। কী হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। এ রকম তো আমার কখনো হয় না।

বিমান আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, কী হলো রে, কী হলো ?

আমি বললুম, জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।

— চুপ করে বসে থাক, উঠিস না।

— আমার কিছু হয়নি।

— তবু বসে থাক। একটা জিনিস দ্যাখ, সুনীল, এই পাথরের নিচের ঘাসগুলো দ্যাখ ? কেমন যেন খয়েরি হয়ে গেছে। ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়ে যায়, কিন্তু খয়েরি ? তুই কখনো খয়েরি ঘাস দেখেছিস ?

— এ বোধহয় অন্য জাতের ঘাস।

— পাশের এই গাছটা দ্যাখ। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লাল রঙের গাছ কখনো দেখিনি।

বিমান, ঐ যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

— আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে। এমনি এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে ইস। মোষটাকে ওর মালিক কেন যে ফেলে গেল।

—বিমান, আমার ইচ্ছা করে এখানে শুয়ে পড়তে।

— মন্দ বলিসনি। এখানে খানিকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হয়।

—যদি নৌকোটা চলে যায় ?

— ইস, গেলেই হলো, পুরো পয়সা দিয়েছি না। তাছাড়া যদি যায় তো চলে যাক। আমরা এখানেই থেকে যাবো।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম, বিমান, বিমান, এই পাথরটা জ্যান্ত।

বিমান বললো, কী বলছিস ? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

— না রে, আমি সত্যি দেখলুম। পাথরটা নড়ে উঠল।

— কী বলছিস যা-তা। পাথরটা নড়বে কি করে ?

— আমি স্পষ্ট দেখলুম, পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল,

আবার ফুলে উঠলো। ঠিক ব্যাঙের মতন।

—দূর। পাথরের আবার পেট কী? তুই ভুল দেখেছিস।

—মোটেই ভুল দেখিনি।

বিমান গিয়ে পাথরটার গায়ে হাত দিতেই আমি বিমানের অন্য হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলুম ওকে। আমার বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ আওয়াজ হচ্ছে। ঐ পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ঐ পাথরটার কিছু একটা ব্যাপার আছে।

দূরে শুনতে পেলুম বুড়ো মাঝি আর সুলেমান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে, বাবু। বাবু।

আমি বললুম, চল, বিমান নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমান বললো, না— এক্ষুনি যাবো না। এখানে শুয়ে থাকবো বললুম যে।

না, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। চল, নৌকোয় ফিরে যাই।

বিমানকে প্রায় জোর করেই আমি টানতে টানতে নিয়ে চললুম। তারপর নৌকোয় উঠেই বুড়ো মাঝিকে বললুম, চলো, শিগগীর চলো।

নৌকোয় উঠে বিমান লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো। তার চোখ দুটো ছলছল করছে। ভাঙ্গা গলায় বলল, আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে।

সুলেমান আমাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ঐ দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বলো তো?

সুলেমান বললো, কী জানি বাবু, ওখানে গেলেই মনটা কেমন কেমন করে। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

বুড়ো মাঝি বললো, বাবু, আগে তো আমরা ঐ চরে যেতাম। বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে ওখানে নৌকো বেঁধে চালা ঘরটায় বসে জিরোতাম। অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মোহিষ চরাতে আসতো। এখন আর কেউ যায় না।

—কেন যায় না বলো তো?

—ওখানে গেলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গরু-মোষগুলোও আলসে হয়ে পড়ে। কেমন যেন মনমরা লাগে।

—আমাদেরও সেই রকমই লাগছিল। কিন্তু কেন হয় ওরকম বলো তো?

—কী জানি। গাছপালাগুলো কেমন ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখলেন না? ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে।

—ওখানে একটা বড় পাথর আছে দেখেছো? আগে ওটা ছিল?

—না, আগে ছিল না। এই তো মাসখানেক ধরে দেখছি।

—কী করে পাথরটা ওখানে এলো?

—কেউ তা জানে না। কেউ কেউ বলে ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

আমার মাথাটা এখনও দুর্বল লাগছে। আমি আর কথা বলতে পারলুম না। শুয়ে পড়লুম বিমানের পাশে।

হলদিয়ায় ফিরে এসে আমরা দু'জনেই সোজা চলে গেলুম বিছানায়। রাত্তিরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করলো না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলুম। তার মধ্যে বারবারই দেখতে লাগলুম সেই পাথরটাকে। ঠিক একটা ব্যাঙের মতো তার পেটটা একবার চুপসে যাচ্ছে। একবার ফুলছে। একটা জ্যান্ত পাথর। আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলুম।

সকালবেলা বিমানের দাদা স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি?

স্বপনদাকে সব কথা বলতেই হলো। স্বপনদা সবটা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাসনি। একটা জ্যান্ত পাথর ... সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মন খারাপ হয়ে যায়, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দূর! যত সব।

বিমান বললো, দাদা আমি পাথরটাকে নড়তে দেখিনি। সুনীল দেখেছে। কিন্তু আমারও ওখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

—বেশ করছিল। শুয়ে থাকলেই পারতিস।

—তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই ঐ মোষটার মতন অবস্থা হতো।

আমি বললুম, স্বপনদা, নৌকোর মাঝিরাও কেউ ঐ দ্বীপটায় এখন যেতে চায় না। ওরাও ভয় পায়। পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।

স্বপনদা বললেন, পুলিশও তোদের কথা শুনে আমার মতন হাসবে। দেখবি, মিঃ দাসকে ডাকবো?

হলদিয়ার এস ডি পি ও মিঃ দাস স্বপনদার বন্ধু। স্বপনদা তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মিঃ দাস, একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবেন। আর একটা মজার গল্প শোনাবো।

দশ মিনিটের মধ্যেই মিঃ দাস এসে গেলেন। তিনি বললেন, শুধু এক কাপ চা খাবো। বড্ড কাজ পড়েছে, এক্ষুণি যেতে হবে। কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চ

হয়েছে গঙ্গায়।

স্বপনদা বললেন, বসুন, বসুন। কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিল আগুনমারির চরে। সেখানে নাকি ওদের এক সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা দু'জনে—

স্বপনদাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশ সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দু'জনে কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য ব্যাপার ঐ দ্বীপটার পাশেই তো কাল রাত্তিরে লঞ্চটা ডুবেছে। ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই। শুধু শুধু একটা লঞ্চ ডুবে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, কেউ মারা গেছে?

পুলিশ সাহেব বললেন, নাঃ। মরেনি কেউ। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু লঞ্চটা যে কী করে ডুবলো তা ওরা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারছে না। সবাই বলছে, কী যেন হলো কিছুই জানি না। হঠাৎ একটা ধাক্কাতে লঞ্চটা কেঁপে উঠলো, তারপরই হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগলো।

স্বপনদা বললেন, লঞ্চটা একদম ডুবে গেছে বলতে চান?

পুলিশ সাহেব বললেন, হ্যাঁ। সেটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ লঞ্চের একজন খালাসি শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চর থেকে একটা মস্ত বড় পাথর নাকি উড়ে এসে প্রচন্ড জোরে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়। এরকম গাঁজাখুরি কথা কেউ শুনেছে? গঙ্গার ওপরে দ্বীপ। সেখানে পাথর আসবে কী করে? যদি বা পাথর থাকে, সেটা কেউ না ছুঁড়লে এমনি এমনি উড়তে উড়তে আসবেই বা কী করে?

স্বপনদা বললেন, এরাও ঐ দ্বীপে একটা বড় পাথর দেখেছে বলছে।

পুলিশ সাহেব বললেন, ভোরবেলা আমি আমার লঞ্চে সেই দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর টাথর কিছু নেই। মানুষজনের কোন চিহ্ন নেই। শুধু একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।

আমি আর বিমান চোখাচোখি করলুম। আগুনমারির চরের পাথরটাই যে লঞ্চটাকে ডুবিয়েছে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

লোকসান না লাভ?

আশাপূর্ণা দেবী

একেই বলে ললাটলিপি।

কবে থেকে ঠিক হয়েছিল এবার পুজোয় গ্যাংটক। পরপর দু'বছর সমতলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছে, এবারে পাহাড় চাই।

এই চাওয়াটি অবশ্য নীতু আর পিতু দুই ভাইবোনের। ক'বছর আগে একবার দার্জিলিংয়ে যাওয়া হয়েছিল তখনই ওরা গ্যাংটক গ্যাংটক করেছিল। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বাবার ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

এবার ওরা নাছোড়।

নীতুর বাবা বলেছিলেন, এত দেশ থাকতে গ্যাংটক! কী যে মাথায় চাপে তোদের।

তাহলেও রাজি হয়েছিলেন।

সমস্ত ঠিক। হোটেল বুক করা টিকিট কেনা সব প্রস্তুত, হঠাৎ বাবা অফিস থেকে ফিরে বলে উঠলেন গ্যাংটক যাওয়া হবে না।

— হবে না মানে!

নীতুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল আর পিতু বসেই পড়ল।

— ও বাপী হবে না মানে?

— হবে না মানে হবে না। ওদিকে এখন দারুণ গোলমাল চলছে।

নীতু পিতুর মাও প্রায় বসে পড়ে বললেন, অফিসের লোক বলেছে বুঝি? তাই একেবারে বেদবাক্য।

— শুধু অফিসের লোক কেন, দেশসুদ্ধ সবাই বলবে। কাগজ পড়ছ না? দেখছ না কী হচ্ছে ওদিকে।

— কাগজে অমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। যাবার জন্যে পা বাড়ানো, আর এখন বলে বসলে যাওয়া হবে না। গেলে দেখবে তেমন কিছুই গোলমাল নেই।

নীতু পিতু অবশ্যই মায়ের সমর্থক।

কিন্তু ভাগ্য ওদের সমর্থক নয়।

পরদিনই ওদের সেই সিট বুক করে রাখা গ্যাংটকের হোটেল থেকে একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির ঃ 'খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি — অনিশ্চিতকালের জন্যে আমাদের হোটেল বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি। অতএব আপনারা ...'

অর্থাৎ পৌঁছে গেলে যাতে না অসুবিধেয় পড়তে হয় খদ্দেরকে, তাই এই অগাধ বিবেচনা।

নীতুদের বাবা বললেন, বলতেই হবে লোকটা খুব ভদ্র।

নীতু পিতু আড়ালে এসে বলল, বলতেই হবে লোকটা অতি অভদ্র।

কিন্তু সে তো হল। এখন কিংকর্তব্য?

ছুটি শুরু হতে তো মাত্র তিনটি দিন। এর মধ্যে নতুন আর একটা জায়গায় যাওয়ার কথাই ওঠে না। টিকিট কোথায়? গিয়ে ওঠা হবে কোথায়? বলে দেড় দু'মাস আগে থেকে এসব ব্যবস্থা করতে হয়। এখন নো হোপ।

কিন্তু তাই বলে কোথাও যাওয়া হবে না?

বিজয়বাবু, মানে নীতুদের বাবা বললেন, তবে আর কী হবে? তোমরা চন্দননগরে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে এস — আমি যা হোক করে চালিয়ে নেব।

চন্দননগরে নীতুদের মামার বাড়ী।

নীতুদের মা রেগে বললেন, আহা, মা, বাবা, পিসিমা ...., আগে থেকে বেনারসে গিয়ে বসে আছেন না? চন্দননগরে কার কাছে যাব?

ওহো তাও তো বটে।

মিনিট খানেক টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা মেরে বিজয়বাবু বলে উঠলেন, তাহলে এক কাজ করা যাক, ছুটিটা গানুডিতে কাটিয়ে আসা হোক।

— গানুডি!

— গানুডি!

— হ্যাঁ গানুডিই। কেন নয়? ওখানে যেতে ট্রেনের টিকিট, রিজার্ভেশন এত সব চিন্তা করতে হবে না, গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। আর কোথায় গিয়ে ওঠা হবে তারও চিন্তা নেই। নিজেদের বাড়ি রয়েছে। যাওয়া তো হয় না সাতজন্মে। তোরা তো জীবনে দেখিস নি।

হ্যাঁ, নিজেদের বাড়িই!

নীতু পিতুর পরলোকগত ঠাকুর্দা না কি ওই 'গানুডি' নামের একদা দেহাতি জায়গায় একদা একখানা বিরাট বাড়ি বানিয়ে বসেছিলেন মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে যাবেন বলে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাগ্যে বেশি বার আর হাওয়া বদলাতে যাওয়া হয়নি সেখানে। অনেক দূরে চলে যেতে হল।

শেষে যখন গিয়েছিলেন সবাই মিলে, পিতু তখন বছর চারেকের আর নীতু এক বছরের।

নীতুদের ঠাকুমা বহুকাল আগেই চন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন।

বিজয়গিন্নী রেগে বললেন, সেই বাড়িতে এখন হঠাৎ গিয়ে থাকা যাবে? সাপ খোপ কী চোর ডাকাতের আড্ডা হয়ে বসে আছে কিনা কে জানে!

বিজয় বললেন, কেন সাপখোপের আড্ডাই বা হবে কেন? মালি নেই? বাবা তাকে ঘরবাড়ি করে দিয়ে চিরকালের জন্য পুষে রেখে যাননি? আর দরাজ হুকুম দিয়ে যাননি ওই বাগানে সে যত ফল ফুল ফলাতে পারবে সব নেবে। তাই থেকেই তার খাওয়া দাওয়া চলবে। মস্ত বাগান তো। চেষ্টা করলে কত কী ফল তরকারী ফলানো যায়।

পিতু হেসে বলল, তা সে সব হয়তো ঠিকই চলছে, তবে বাড়িটা থাকার যোগ্য করে রেখেছে কিনা সন্দেহ।

তারপর বলল, বাড়িটা আমার একটু একটু মনে পড়ছে। মস্ত বড় বাগান, বাগানের মধ্যে একটা মস্ত পরী-পুতুল। আর খুব উঁচু গেট। সেই গেটের লোহায় পা রেখে রেখে গেটের মাথায় উঠে পড়তাম। খুব উঁচু গেট তাই না বাপী?

বাপী হেসে বললেন, এমন কিছু উঁচু না। তবে খুব ছেলেবেলায় একটু বড়কেই অনেক বড় লাগে। তোর দাদুকে মনে পড়ে না?

পিতু বলল, সেও একটু একটু। আমায় পিতু না বলে ডাকতেন প্রীতিরা...নী, আর পাকা পাকা গোঁফ — এই যা মনে পড়ে।

চল। গিয়ে হয়তো আরো কিছু মনে পড়বে।

নীতুর কাছে কোন স্মৃতি নেই। না দাদুর, না দাদুর বাড়ির। কাজেই নীতু বেজার মুখে বলল, মনে পড়েই বা কী হবে? গ্যাংটকের বদলে গানুডি। ধুস! একদম মার্ডার কেস!সেই নাকের বদলে নরুনের মত।

মন মেজাজ খারাপ ওদের মায়েরও। প্রতি বছর কোন না কোন ভাল জায়গায় যাওয়া হয়। ভাল ভাল হোটেলে ওঠা হয়, আরাম আয়েস বিশ্রাম। আর এ কিনা একটা দেহাতি গ্রামে পোড়ো বাড়িতে গিয়ে পড়া। জলের কল বলে কিছু নেই।

ইঁদারা থেকে তোলা জলে যা কিছু কাজ!

— আর নিজেকে রান্না বান্নাও করতে হবে।

পিতু বলল, তা শশীদাকে নিয়ে চল না মা?

— চমৎকার। এখানের বাড়িটি আগলাবে কে অ্যাঁ? আমার কান্না পাচ্ছে!

বেচারী বিজয়বাবুর অবস্থা যেন চোরের মত।

যেন গ্যাংটকে গোলমালটি তিনিই বাধিয়েছেন। সেখানকার 'সোনালী উপত্যকা' হোটেলটি তিনিই বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এখন বৌ আর ছেলেমেয়েদের দুর্গতি ঘটাবার জন্যেই তাঁর বাবার রেখে যাওয়া একটা পোড়ো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন। যেখানে নাকি সাপখোপ আর ডাকাতের আড্ডা।

একরাশ বেজার বিরক্তি, আর একগাদা বেডিং সুটকেস, ব্যাগ, টিফিন কৌটো, বেতের টুকরি, ওয়াটার বটল, ফ্লাস্ক এবং ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার আর গাদাগুচ্ছের গানের ক্যাসেট নিয়ে গাড়িতে চেপে বসা হল। কিন্তু সত্যি বলতে — খানিকক্ষণ চলার পর মনটা বেশ ভালই হয়ে গেল দুই ভাইবোনের। বাবার ওপর একটু কৃপা করুণাও এল।

মাঝে মাঝেই বলতে লাগল, বাপী এতক্ষণ গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? বাপী ঠিক রাস্তা চিনে যেতে পারছ তো? ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না তো?

এইসবের মাঝখানে ক্ষণে ক্ষণেই খাওয়া চলছে। কলা, কমলা লেবু, কেক, ফাইভ স্টার, সল্টেড কাজু, পটেটো চিপস্ আরো কত কী!

বিচ্ছিরি একটা গাঁইয়া জায়গায় যাচ্ছেন বলে ওদের মা 'টুকটাক' সঙ্গে নিয়েছেন বিস্তর। ডালমুটই তো এক বস্তা।

এই সবেতেই মনটা কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাল হয়ে উঠেছিল। তবে এমন একটা ভয়ঙ্কর আহ্লাদের ঘটনা যে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেটা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এক মিনিট আগেও নয়। আবিষ্কারের গৌরব পিতুর।

বাড়ির কাছ বরাবর আসা মাত্রই হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল পিতু, পল্টু কাকা!

পল্টু কাকা! মানে পল্টু।

পল্টু। সে কী? আরে? অ্যাঁ। তুই কোথা থেকে?

বলতে বলতে গাড়ির স্পীড কমিয়ে ফেলে বিজয়বাবু ডাক দেন, আয় উঠে আয়।

পল্টু হেসে হাত নেড়ে বলল, এই তো বাড়ি এসেই গেছে।

সত্যিই এসে গেছে বাড়ি।

বুড়ো মালি ব্যাসদেও ব্যস্ত হয়ে গেট-এর দুটো পাল্লাই দুহাট করে খুলে ধরে পিঠ গোল করে 'সালাম' জানায়।

কিন্তু সেদিকে কে তাকাচ্ছে? এখন আর কেউ নয় শুধু পল্টু।

পল্টুকাকা।

মানে গ্যাংটকে যেতে না পারার দুঃখটা মোচন তো বটেই বরং মনে হল ভাগ্যিস গ্যাংটকে যাওয়া হয়নি। ভাগ্যিস গানুডিতে আসা হয়েছে। নইলে তো পল্টুকাকাকে মিস করা হত!

পল্টুকাকা যে কি নিধি সে তো এরা ভালই জানে।

আর বিজয়বাবু?

প্রায় বছর দু-তিন পরে হঠাৎ এই চিরদিনের স্নেহ আদরের মামাতো ছোট ভাইটিকে দেখে তো আনন্দে বিহ্বল। যেন হাতে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে।

পল্টু সেই যে সেবার বললি 'ম্যাজিক শো' দিতে না কি জাভা না বোর্ণিও কোথায় যাচ্ছিস তারপর একেবারে নো পাত্তা হয়ে গেলি কেন? অ্যাঁ? নিখোঁজ নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলি কোথায় এতদিন? চেহারাখানি তো ঠিকই রেখেছিস দেখছি। যেমনটি ছিল তেমনটি। তা এখানে হঠাৎ মানে এই গাঁইয়া গানুডিতে। —বলে ছেলেমেয়েদের দিকে একবার নজর ফেললেন বিজয়বাবু।

পল্টু বলল, কেন, গানুডিটা কি খারাপ জায়গা? আমার তো এই কদিনেই স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠেছে।

ভাল ভাল। তা কোথায় আছিস?

বাঃ। কোথায় আর। তোমাদের এই 'চারুকুটিরেই'। আফটার অল আমার নিজের পিসির বাড়ি তো? নিজের পিসের তৈরী। থাকাটা দোষ হয়েছে? হা হা হা।

বিজয়বাবু অপ্রতিভ হয়ে বলেন, ছি ছি। কী যে বলিস। মানে বলছিলাম, এখানে একা, খাওয়া দাওয়ার কী করছিস?

কেন, ব্যাসদেও তো রয়েছে। ও আমায় চেনেনা না কী? আমাকে দেখে তো আনন্দে কেঁদেই ফেলল। বলে কেউ তো আসে না। আমি বুড়োবাবুর এই বাড়ি বাগিচা আগলে পড়ে আছি। ওঃ কী যত্ন যে করছে। আর যা ফার্স্টক্লাস রান্না। হা হা হা। মুখ ছেড়ে যায়।

—তো এতদিন ছিলি কোথায়?

—কোথায় নয়?

—মানে খুব ঘুরেছিস?

—হুঁ!

—এখনো ম্যাজিক দেখাস?

—বা। ওটাই তো আমার পেশা। পেশা আর নেশা এও হচ্ছে স্বভাবের মত। মরলেও ছাড়ে না।

মায়ের তাড়নায় এতক্ষণে পিতু আর নীতু হাত মুখ ধোয়া সেরে ছুটে এসেছে। এখন দুজনে পল্টুকাকার দুদিকে।

—ও বাপী তুমি আর কতক্ষণ পল্টুকাকাকে নিয়ে আটকে রাখবে? ও পল্টুকাকা সব গপপো তোমার প্রাণের বন্ধু বিজুদার সঙ্গে করে ফেলছো? ইস, আমরা বলে তোমার জন্য ... ইঃ। তোমায় দেখে না আমাদের।..... জান পল্টুকাকা, আমাদের গ্যাংটকে যাওয়ার কথা ছিল ...।

পল্টু চমকে বলল, কেন? গ্যাংটকে কেন?

—বাঃ। কেন আবার, এমনি। তো সেখানে যাওয়া হল না—

—ভালই হয়েছে।

—তা সত্যি। ভাগ্যিস যাওয়া হয়নি।

দুই ভাইবোনে একযোগে কথা বলে চলেছে, তাই না বাপীর বাবার এই গানুডিতে আসা হল। আর তোমাকে পেয়ে যাওয়া হল। ও পল্টুকাকা কী মজা! নাচতে ইচ্ছে করছে আমাদের।

—ও পল্টুকাকা, তাস আছে তোমার সঙ্গে? ম্যাজিক দেখাবে তো? ইস। আমরা যে তাসগুলো কেন আনলাম না! ও বাপী তোমার এই গানুডিতে তাস পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়? যদি পল্টুকাকার কাছে না থাকে?

পল্টু বলে ওঠে, আরে বাবা, আগে থেকেই হতাশ হচ্ছিস কেন? আছে আছে। ভানুমতীর খেলের অনেক কিছুই আছে সঙ্গে। ভেবেছিলাম আর ম্যাজিক ফ্যাজিক নয়। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও ম্যাজিক আমায় ছাড়তে চায় না।

—বাঃ ছাড়তে চাইছিলে কেন?

পল্টু একটু রহস্যময় হেসে বলল, সে অনেক কথা। গিয়েছিলাম জাভায়। সেখানে ম্যাজিক দেখে একটা দল হঠাৎ আমায় যাদুকর ভেবে .....

—ও মা। ম্যাজিক দেখানোওয়ালারা তো যাদুকরই। পি সি সরকার, জুনিয়ার পি সি সরকার এঁরা সব 'যাদুসম্রাট', 'যাদুর রাজা' এই সব নয়?

—আরে সে তো আমরা জানি। ওরা ভাবে যাদুকর মানে ডাইনী।

—হি হি। পুরুষ মানুষ আবার ডাইনী হয়?

পল্টু গম্ভীরভাবে বলে, বোকাদের কাছে এমন কত হয়। সে যাকগে, তোরা খাওয়া দাওয়া করবি না? সেই কখন ভোরবেলা বেরিয়েছিস।

পিতুর মা হেসে গড়িয়ে পড়েন, আহা, পল্টু ঠাকুরপো, ওরা যেন সারা রাস্তা নির্জলা উপোসে এসেছে। সারাক্ষণ মুখ চলেছে —

সঙ্গে সঙ্গে নীতু হৈ চৈ করে ওঠে, ও পল্টু কাকা সল্টেড কাজু খাবে? 'মুখরোচক মুড়মুড় ভাজা'? পটেটো চিপস্? মা, বেতের সেই টুকরিটা?

পল্টু বলল, হবে হবে। এখন দেখ গিয়ে ব্যাসদেও তোদের জন্য কী ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছে।

নীতুদের মা কতই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, বাড়িটা সাপখোপের আড্ডা হয়ে আছে, হয়তো গিয়ে নিজেকে রান্নাবান্না করতে হবে, বেড়ানোর বারোটা বেজে যাবে, মনের কষ্ট আরো কত কী!

কিন্তু দেখে লজ্জাতেই পড়ে গেলেন।

অতবড় বাড়ি, অতবড় বাগান সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট। কোথাও নেই একটু ধুলোবালি। তবে বাগানের মাঝখানের সেই আস্ত মানুষের মাপে কংক্রিটের তৈরী সেই পরী-পুতুলটার যদি এতদিনের রোদে জলে নাক খেঁদিয়ে যায়, আর সর্বাঙ্গে ফাটল ধরে, তাহলে ব্যাসদেও কী করবে? আর গেটের লোহার রেলিংগুলো মরচে পড়ে খসে খসে পড়তে চাইলেই বা বেচারী বুড়ো মানুষ কী করবে? বাড়ির আসবাবপত্রও জীর্ণ হয়ে গেলে উপায় কী? তবুতো সব ঝেড়ে মুছে রেখেছে।

আর রান্না?

এরা আসামাত্রই কি করে যে সব বানিয়ে ফেলল।

ভোরবেলা বেরিয়ে বেলা একটা নাগাদ এখানে পৌঁছানো গেছে, আর বেলা দুটোর মধ্যে সব রেডি। টেবিলে খাবার সাজানো।

এরা তো হাঁ।

—ও ব্যাসদেও —! তুমি তো জানতে না আমরা আসব। কি করে এতসব করলে? ব্যাসদেও চিরকালই অল্পভাষী। এখন আরো বেশী। কাজেই তার উত্তর শুধু দাড়ির খাঁজে একটু হাসির মত।

নীতুদের বাবার এখন আর 'চোর' ভাব নেই। বরং রাজার ভাব। যেন, কী? এখানে আনাটা খুব খারাপ হয়েছে?

—এ কী! শুধু আমাদের থালা? পল্টু তুই খাবি না?

—আরে আমায় তো ব্যাসদেও সেই বারোটার আগে খাইয়ে দিয়েছে।

—আচ্ছা পল্টু তোরা কি করে জানলি আমরা আসছি।

—মনে মনে।

—তাজ্জব। আসা মাত্রই চা। গোসলখানার চৌবাচ্চা ভর্তি জল। আর এই সব রান্না। নীতু দেখছিস? গোবিন্দভোগ চালের ভাত, ভাজা মুগের ডাল, আলু ভাজা, কপি কড়াইশুঁটির তরকারি, মুরগি, টমেটোর চাটনী। ভাবা যায় না। বল? পল্টু, বাজার করলো কে? আর কখনই বা? এখানে তো মাত্র হাটবার এর ওপরই নির্ভর।

ব্যাসদেও বলল, বাজার লাগবে কেন? সবই তো আপনার বাগানের। বাদে চাউল। ওটা স্টকে থাকে।

—সব বাগানের?

—জী হাঁ।

—আর মুরগী? সেও গাছে ফলে? হা হা হা।

—ও তো পোষা আছে।

বিজয়বাবু বললেন, পল্টু দেখছিস। বাবা কত বুদ্ধির কাজ করে রেখে গেছেন। আর আমার পুত্রকন্যা বাড়ি দেখে বলছিল কিনা এইরকম একটা অজজায়গায় এতবড় একখানা বাড়ি বানানোর কোনো মানে হয় না। দাদুর বাপু বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না।

পল্টু তার স্বভাবগতভাবে হেসে ওঠে। বলেছে বুঝি? হা হা হা। ওদের খুব বুদ্ধি? হো হো হো।

অনেকদিন পড়ে থাকা বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যেন সেই হাসিটা ধাক্কা মেরে মেরে আরো অনেকক্ষণ আওয়াজ তুলতে থাকে।

নীতু আর পিতুর গা ছমছম করে ওঠে!

মায়ের দিকে তাকায়। দেখে মাও কেমন ভয় ভয় চোখে দেওয়ালগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন।

খেয়ে উঠে তো অনেকক্ষণ গল্প, বাগানে গিয়ে ফটো তোলা, পল্টু কাকাকে ক্যাসেট শোনানো হল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে জোর আবদার — ও পল্টুকাকা, কখন তাস বের করবে, কখন ম্যাজিক দেখাবে?

— হবে হবে। একেবারে বিকেলের চা খেয়ে দোতলায় ওঠা হবে। অতঃপর পিসেমশাইয়ের বড় ঘরটায় বসে — সব ঘরে তো তালা চাবি লাগানো। শুধু ওই ঘরটাই আমি খুলিয়ে নিয়েছি।

— বাপী কটা ফিল্ম এনেছ?

— চারটে।

— বেশ বেশ। পন্টুকাকা কাল ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়ে ছবি তোলা হবে কী বল?

— আরে আজ তো তুললি কতগুলো?

— ও তো বাড়ির লোকের। কাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের তোলা হবে। ব্যাসদেও তুমি কিন্তু আজ ফাঁকি দিয়েছ। গ্রুপ ফটো তোলার সময় 'কাজ আছে' বলে পালিয়েছ। কাল সকালে তোমার লম্বা দাড়ির একটা ফটো তোলা হবে। হি হি হি।

বিকেলে চা খেতে খেতে নীতুদের মা বললেন, একটা আশ্চর্য। এতবছর কেবল মাত্তর নিজের ডাল-রুটি পাকিয়ে চালিয়ে এসেও ব্যাসদেওয়ের রান্নার হাত কী! চোস্ত রয়েছে।

বিজয়বাবু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। বললেন, বাবা ওকে নিজে তালিম দিয়ে ভাল ভাল রান্না শিখিয়েছিলেন।

— রাত্রে কী খাওয়াবে ব্যাসদেও। বলল নীতু।

— যা আপনাদের মর্জি।

পিতু হি হি করে হেসে উঠে বলে, যা আমাদের মর্জি? যদি বলি বিগ বিগ চিংড়ির মালাইকারী, মাটন রোল, আর মোগলাই পরোটা?

ব্যাসদেও দাড়ির ফাঁকে একটু হাসি দেখায়, হোবে। সব হোবে।

হো হো হাসির রোল উঠল অর্থাৎ ব্যাসদেও ও ঠাট্টা তামাসা করতে জানে।

কিন্তু শুধুই হাসি গল্প চালালে চলবে কেন?

— ও পন্টুকাকা, তাস বের কর।

— বলছিস?

— বলছিই তো। আর দেরি করলে কিন্তু আমরা গিয়ে তোমার বাক্স হাতড়ে বের করে আনব।

পন্টু বলে ওঠে, আনবি কী, এনেই তো ফেলেছিস!

— অ্যাঁ। কই? কোথায়?

হঠাৎ দেখা গেল ঝড়ের সময় শুকনো পাতা ছিটকে আসার মত জানলা দিয়ে বাইরে থেকে সাহেব বিবি গোলামরা ছুটাছুট ছিটকে চলে আসছে ঘরের মধ্যে।

দারুণ। — তার মানে শুরু হয়ে গেছে পন্টু কাকার ম্যাজিক।

এটি যে পন্টুর 'নতুন অবদান' তাতে সন্দেহ নেই। এরকমটি আগে কখনো

দেখেনি এরা।

কিন্তু কী মুশকিল। এ যে এসেই চলেছে। ঘরের মেঝে, খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আলমারির মাথা সব বোঝাই হয়ে গেল তাসে।

— ওরেব্বাস। বিজয়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, ও পল্টু, এবার থামা। একী খেলা শিখে এসেছিস বাবা জাভা থেকে না কোথা থেকে? কশো জোড়া তাস এনেছিস বাবা?

নীতুদের মাও কোলের ওপর থেকে সাহেব বিবি টেক্কা দশদের ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, সত্যি বাবা। ও পল্টু ঠাকুরপো, এগুলো তাস না আমাদের চোখের ভ্রম? স্রেফ ইন্দ্রজাল?

নীতু আর পিতু কথাই বলতে পারছে না। দুজনে দুজনের সঙ্গে প্রায় সেঁটে গেছে।

তারা সেই চিরাচরিত খেলাই দেখতে চেয়েছিল। যেমন ম্যাজিক দেখানেওয়ালার হাতের ছড়ানো তাস থেকে মনে মনে ভাবা একটি তাস, দশ হাত দূর থেকে চলে এল তার নিজের পকেটে। কিংবা প্যাকেটের বাহান্নখানা তাসই হয়ে গেল নীতুর ভাবা তাসটি। অর্থাৎ সবগুলোই চিড়িতনের টেক্কা বা ইস্কাবনের বিবি।

অথবা নীতু নিজে সাফল করে কোনো একটি তাস বেছে নিজের হাতের মধ্যে রেখে প্যাকেট ফেরত দিয়ে দেখল সেই তাস পল্টুকাকার সেই প্যাকেটের মধ্যে।

আর নীতুর কাছে রাখা তাসটা? সেটা একটা তাসই নয়। একখানা তাসের মাপের সাদা কার্ড।

এই সমস্তই দেখেছে নীতুরা আগে। তাতেই মোহিত হয়েছে, হৈ চৈ করেছে, চোখ গোল করেছে। এটা আবার কেমন বাবা।

আজ তো ওরা দুই ভাইবোন পরামর্শ করে রেখেছিল ভীষণভাবে চোখ ঠিকরে লক্ষ্য করে হাত সাফাই দেখবে পল্টুকাকার। এ খেলা সেদিক দিয়েই গেল না। গেল না মানে কী? যাচ্ছে না। ঘরের শিলিং থেকে বালি চাপড়া খসে পড়ার মত এখনো তাস ঝরছে।

পিতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কেবল তাস জমে জমে পাহাড় হচ্ছে, ম্যাজিক দেখব কখন?

— কী মুশকিল, এটা ম্যাজিক নয়? হো হো করে হেসে উঠল পল্টু।

আবার সেই পুরনো বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে হাসির প্রতিধ্বনি।

এখন বেলা পড়ে গিয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে।

পন্টু বলল, তো দেখ বাবা বাহান্নখানার খেলাই দেখ। বলে হুশ করে একবার কাক তাড়ানোর মত হাত নাড়ল পন্টু। আর সেই তাসের পাহাড় এক পলকে গুছিয়ে একটি ছিমছাম প্যাকেট হয়ে পন্টুর বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে। ঘরে আর কোথাও নেই একখানিও তাসের চিহ্ন।

এখন হাততালির ধূম।

বিজয়বাবু বললেন, নাঃ অনেক নতুন খেল্ শিখে ফেলেছিস দেখছি এই দু-তিন বছরে। এসব খেলা কোথা থেকে শেখা রে পন্টু?

পন্টু হেসে ওঠে, কেন? তুমি সেখানে গিয়ে শিখে নেবে? অমন কাজটি করো না।

নীতুর মা হেসে ওঠেন, হ্যাঁ, তোমার দাদাটি নইলে আর কে তাসের ম্যাজিক শিখবে। কোনটা কী তাস তাই জানে কিনা সন্দেহ।

এই সময় হঠাৎ কে যেন ঘরে একটা পেট্রোম্যাক্স বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু কে ও? ও তো ব্যাসদেও নয়। দাড়ি কই ওর?

বিজয়বাবু একটু চমকালেন, কে লোকটা?

পন্টু বলল, আরে ব্যাসদেওয়ের একটা ভাইপো আছে কাছাকাছি। কাকার সাহায্য করতে আসে। কাল ও আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। আসলে বুড়ো এই আলোটা জ্বালাতে জানে না।

হেসে ওঠে পিতু, এত ভাল ভাল রান্না করতে পারে আর একটা হ্যাজাক জ্বালতে পারে না?

— সবাই কি সব পারে?

পন্টু আবার হেসে ওঠে, আর বলে, এই যে বিজুদা এত মোটরগাড়ি চালাতে পারে, আমি একটা গরুর গাড়িও চালাতে পারি না।

এই রকমই কথাবার্তা পন্টুর। না হাসিয়ে ছাড়ে না। বিয়েটিয়ে করেনি, কেবল বাউন্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায় আর ম্যাজিক শেখে এবং দেখায়।

ম্যাজিকের একটা দলও আছে তার।

তবে সে সব তো জগঝম্প আসবাব পত্র নিয়ে। এমন ঘরোয়া আসরে চলে না। তাসই বেস্ট। সর্বত্র চলে।

সেই তাসের পাহাড়কে বাহান্নখানায় দাঁড় করিয়ে পন্টু এবার তার সেই পুরনো খেলা দেখাল কিছু কিছু। যাতে সকলের আনন্দ। তবে তার সঙ্গে নতুন কিছুও জুড়ল, রীতিমত রোমাঞ্চকর।

যেমন নীতুর পকেটে রাখা হরতনের নহলাকে একটা একশো টাকার নোট

করে দেওয়া।

আবার তাসকে দোকানের ক্যাসমেমো, লন্ড্রির বিল, ওষুধের প্রেসক্রিপশন, বাসের টিকিট, ছেঁড়া শালপাতা বানানো এইরকম সব অনেক খেলা।

নিথর পাথর হয়ে বসে দেখতে দেখতে কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে কেউ টের পায়নি। সিঁড়ির সামনে একটা গলা খাঁকারি। দরজার কাছে সাদা দাড়ির আভাস।

বিজয়বাবু বলে উঠলেন, ছি ছি, কত রাত হয়ে গেল। চল চল খেয়ে নেওয়া যাক। বেচারা বুড়োমানুষ এতক্ষণ বসে আছে।

বসে আছে কী? হি হি দু'ভাইবোন একসঙ্গে হি হি করে হেসে ওঠে, ও এতক্ষণ বাগানের গাছ থেকে বিগ বিগ গলদা চিংড়ি পেড়ে মালাইকারী রাঁধছিল।

সিঁড়িতে নামার সময় পল্টু আবার একটু নতুন খেলা দেখিয়ে মাৎ করে দিল। তাসেদের অর্ডার দিল, এই তোরা সব যেখান থেকে এসেছিলি, সেখানে ফিরে যা।

আর বলা মাত্রই তাসগুলো বোঁ বোঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিজয় গিন্নী সরে এসে মেয়ের হাত ধরলেন। মেয়ে ভাইয়ের হাত। এ কী সাঙ্ঘাতিক খেলা বাবা। পি সি সরকারের মানুষকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলার থেকে কিছু কম নয়। যেন অলৌকিক। অথবা ভৌতিক।

যাই বলিস পল্টু, এই বছর দুই তিন বাইরে ঘুরে এসে অনেক লাভবান হয়েছিস।

— লাভবান? তা হবে?

আবার সেই পেটেন্ট হাসি পল্টুর হা হা হা। যেটা কলকাতার বাড়িতে খুবই আনন্দের আর মজাদার। কিন্তু গানুডিতে ঠাকুর্দার আমলের এই খাঁ খাঁ করা বিশাল বাড়িটায় যেন গা ছমছমানো।

কিন্তু খাবার টেবিলে বসে তার শতগুণ গা ছমছমানি।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে ব্যাসদেও।

ফুটখানেক করে লম্বা সাইজের গলদা চিংড়ির কারি, মটনরোল, মোগলাই পরোটা।

নীতু বলল, আমার খেতে ভয় করছে।

পিতু বললো, লোকটা ভূত না ভগবান?

ওদের মা বললেন, ওকেও কি ম্যাজিক শিখিয়ে ফেলেছ পল্টু ঠাকুরপো? তাসের মত কারবার। ডাল রুটিকে এইসব দেখছি। যেমন বাহান্নখানা তাস

বারশো হয়ে যাওয়া।

শুধু বিজয়বাবুই তারিফ করে খেতে লাগলেন। এবং রাত্রে তিনি আর পল্টু একটা ঘরে এবং বাকিরা আর একটা ঘরে শুয়ে পড়ল।

কথা হল পরদিন ভোরে সবাই মিলে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরনো হবে।

বারান্দার ওধারে হাতমুখ ধোবার জন্যে দু বালতি ভর্তি জল।

মা বললেন, লোকটা ময়দানব না কী রে বাবা?

— ও মা, এ সেই সিনেমার 'গল্প হলেও সত্যি'র কাজ করার লোকের মত।

— যা বলেছিস।

— ব্যাসদেও। আমাদের কিন্তু পাঁচটার সময় চা চাই।

— জী হাঁ। সেলাম ঠুকে চলে গেল ব্যাসদেও।

আর বলব কী পাঁচটার আগে উঠে পড়েও নীতুরা দেখল দোতলায় বারান্দায় বেতের টেবিলের ওপর টিকোজি ঢাকা দিয়ে চা আর কাপ ডিশ চিনি-টিনি ইত্যাদি সাজানো।

বিজয়বাবু বললেন, হোটেল বলে আক্ষেপ করছিলে, কটা ভাল হোটেলে তুমি এমন সার্ভিস পাবে? কোন একটা জিনিস চাইলে তো দিতে ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। যাক চটপট রেডি হও।

কিন্তু পল্টুকাকা?

— বাপী পল্টুকাকা কই?

বিজয়বাবু বললেন, সে তো বাপু কখন উঠে পড়েছে জানি না। ঘুম ভেঙে তো দেখছি না।

— বাঃ চা খাবে না? দেখ কোথায়?

— সে হয়তো ব্যাসদেওর সঙ্গে চা খেতে লেগে গেছে। পল্টু দাদাবাবুর ওপর ভারি ভক্তি ব্যাসদেওর।

বিজয়বাবু সিঁড়ির ধারে এসে গলা তুলে হাঁক পাড়লেন, পল্টু! পল্টু! ব্যাসদেও। ব্যাসদেও।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। কোথায় বা পল্টু কোথায় বা ব্যাসদেও। রান্নাঘরের দরজায় শুধু শেকল তোলাই নয়, তাতে একটা মর্চে পড়া তালাও লাগানো। এই ভোর সকালে দুটোতে গেল কোথায়।

— আর কোথায়। এতজনের 'ভোজ'-এর রসদ জোগাড় করতে।

— এত ভোরে এখানে বাজার বসে?

— আরে না না, এসব দেহাতি জায়গায় চাষীদের বাড়ি থেকে জিনিষ নিয়ে

আসা যায়। সব্জি, ফল, ডিম, দুধ, মাখন। দেখেছি আগে।

পিতু হি হি করে হেসে বলে ওঠে, আর চুপি চুপি এনে রেখে বলা যায়, বাগানে ফলেছে।

কিন্তু কই রে বাবা আসছে কই?

— নাঃ। বেড়ানোটা মাটি করল দুটোয়।

— নাঃ। মার্ডার কেস। রোদ উঠে গেল। দেখা নেই ওদের।

এদের সাজা গোজা রেডি। গাড়িতে ক্যামেরা তোলা হয়ে গেছে। কিছু খাবার দাবারও।

— ও বাপী, কী হবে? জমিতে চাষ করিয়ে সব্জি টব্জি আনছে না কী তোমার ব্যাসদেও?

বাপী বললেন, সত্যি এত দেরি করছে কেন? যাক, এক কাজ করা যাক, গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া হোক। চারদিকে তাকাতে তাকাতে যেতে হবে। নিশ্চয় দেখা হয়ে যাবে।

তবে তাই। ছুটফট্টানিটা তো কাটুক। কোথাও বেরবার সময় যদি কারো জন্যে অপেক্ষা করতে হয় তার থেকে যন্ত্রণা আর নেই।

বেরনো হল। এবং চারজনের চার দুগুণে আটটা চোখ রাস্তার আশপাশ সামনে পিছনে তদন্ত করতে করতে চলল।

কিন্তু কোথায় কী? নো পাত্তা। দু দুটো মানুষ যুক্তি করে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেনি তো? দূর আবার রাস্তা কোথায়? আচ্ছা বাগানে ছিল না তো? দূর! অত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করা হলো।

এইসব বলাবলির মধ্যে হঠাৎ এক কান্ড হয়ে গেল। বিজয়বাবুর গাড়িকে 'ভুলভুলাইয়া' পেয়ে বসল। যেদিক দিয়েই এগোতে যান ঘুরে ফিরে সেই একই রাস্তা।

— কী হল বাপী?

— বুঝতে পারছি না তো। বিজয়বাবু বললেন, গাড়ির ওপর কন্ট্রোল রাখতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন নিজের ইচ্ছেয় চলছে।

— বাপী কোন কিছু না ভেবে কোনো একদিকে সোজা বেয়ে যাও।

— তাতে কী হবে?

— এই গোলকধাঁধাটা থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে।

— কিন্তু তারপর? রাস্তাটা চেনাবে কে?

— চেনাবে রাস্তার লোক। জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।

— কিন্তু জিজ্ঞেস করার মত লোকই বা কোথায়? এমননিতেই তো ফাঁকা মেঠো রাস্তা। যাও বা দুএকজন যাচ্ছে, তারা নেহাতই বোবা মত।

দেখতে দেখতে অনেক দূর আসা হয়ে গেল। কী ভাগ্যি হঠাৎ একটি ভব্যিযুক্ত লোককে দেখতে পাওয়া গেল। মধ্য বয়সী। বোধহয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই অক্টোবরেও গলায় কম্ফর্টার মাথায় টুপি। গায়ে ধুতির ওপর লম্বা কোট।

বিজয়বাবুর প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।

— গানুড়ি এখান থেকে কত দূর? গানুড়িতেই তো রয়েছেন মশাই।

বিজয়বাবু নিজে মনে মনে অবাক হন। এতখানি গাড়ি চালিয়ে এসেও তবে চটপট সামলে নিয়ে বলেন, না মানে গানুড়ির 'চারুকুটিরের' রাস্তাটা ...

— চারুকুটির। ভদ্রলোক আরও অবাক হয়ে বলেন, চারুকুটির? কোন চারুকুটির?

বিজয়বাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, চারুকুটির এখানে কটা আছে মশাই আমার জানা নেই। আমি খাসনবীশদের চারুকুটিরের কথা বলছি। স্বর্গীয় অজয় খাসনবীশের বাড়ি।

— মাই গড্। অজয় খাসনবীশের চারুকুটির। সেইখানে আপনারা উঠতে যাচ্ছেন?

নীতু আর পারে না। টনটনে গলায় বলে ওঠে, উঠতে যাব কেন? সেইখানেই তো আছি। শুধু সকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটু রাস্তা গুলিয়ে ফেলে ...

— সেইখানে আছো? মানে চারুকুটিরে? মানে খাসনবীশের চারুকুটিরে?

নীতু গলা আরো টনটনে করে, তা এত অবাক হচ্ছেন কেন? থাকব না কেন? বাড়িটা তো আমাদের নিজেদেরই। ওই অজয় খাসনবীশ তো আমাদের দাদু ছিলেন।

ভদ্রলোক মুখটা পাথুরে করে বললেন, কতদিন পরে এসেছ এখানে?

— অনেকদিন পরে।

— হ্যাঁ সে তো বুঝতেই পারছি। তো কবে এসেছ? ওই বাড়িতে ছিলে নাকি?

— ছিলামই তো।

ভদ্রলোক যেন একদল পাগলকে দেখছেন, এইভাবে এদের দলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ছিলে, কোথায় শুয়েছিলে?

— কেন, দোতলার ঘরে। কত ঘর। খাট বিছানা সবই আছে।

— বটে। তো খাওয়া দাওয়া কোথায় করেছিলে?

বিজয়বাবু বিজয়গিন্নী এবং পিতু তিনজনেই বুঝে ফেলেছেন লোকটা সুবিধের নয়। নীতুর সঙ্গে চালাকি খেলছে।

পিতু অলক্ষ্যে নীতুকে একটা চিমটি কাটল। কিন্তু নীতু এখন মরীয়া। রাগের গলায় বলল, কোথায় আবার বাড়িতেই। বুড়ো মালি রান্না বান্না করে দিল। সে যা ফার্স্টক্লাস রান্না।

— বুড়ো মালি? ব্যাসদেও? পাকা দাড়ি?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেনেন তাকে?

— চিনতাম।

ভদ্রলোক নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সে তোমাদের রান্না করে খাইয়েছে! সে তো অনেক দিন হল মারা গেছে।

বিজয়বাবু এখন হাল ধরেন। বলেন, এ কী তামাসা মশাই? ব্যাসদেও কাল দুবেলা আমাদের চব্যচোষ্য খাইয়েছে। আজও সকালে চা বানিয়ে ...

ভদ্রলোক শিউরে উঠে বলেন, এখনো আপনারা টিকে আছেন? খুব লাকের জোর বলতে হবে। যে লোক আজ সাত-আট বছর, কি দশ বছর আগে বাগানে কাজ করতে করতে ইঁদারায় পড়ে মারা গিয়েছিল। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও আসেনি। পাড়ার কেউ ও মুখো হতে যায়নি। কাজেই লাশ উদ্ধার হয়নি। ইঁদারার মধ্যেই সলিল সমাধি। এবং সেই থেকে ওইখানেই তার প্রেতাত্মা বসবাস করছে।

— কী?

— কী আর? সোজা বাঙলায় ভূত হয়ে রয়ে গেছে। ইদানিং নাকি আবার রাতের দিকে খুব হা হা হাসির শব্দ শোনা যায়। অবশ্য বাড়ি বলতে আর তেমন কিছু নেই। বিশাল বাগান শুকিয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে ভরে গেছে। বাড়িটা গাছপালা আর জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য। লোকে ও রাস্তা দিয়ে বড় একটা হাঁটে না।

রাগে মাথা জ্বলে যায় নীতুর। তীক্ষ্ণ গলায় বলে, আপনি বোধ হয় অন্য কোন চারুকুটিরের কথা বলছেন।

ভদ্রলোকও কড়া গলায় বলেন, তা হবে, আমরা মানে এখানের সবাই অজয় খাসনবীশের চারুকুটিরের হিস্ট্রি জানি। ইচ্ছে করলেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন। ওই ভাঙা মসজিদের মোড়টা ঘুরলেই ...

হতভম্ব বিজয়বাবু আস্তে বলেন, আমারই বোধহয় ভুল হচ্ছে। আমাদের সেই চারুকুটির তো অনেক দূরে। প্রায় আধঘন্টা গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছি। ... কিন্তু বাড়ির নাম, মালির নাম দুই মিলে যাবে। স্ট্রেঞ্জ। কাইন্ডলি যদি গাড়িটায় উঠে

এসে আমায় দেখিয়ে দেন। বড় ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি।

আসলে কিন্তু বিজয়বাবু এই লোকটাকেই সন্দেহ করছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভাঁওতাবাজ। অকারণ বিভ্রান্ত করতে চায়। এই রোগ থাকে অনেকের।

ভদ্রলোক উঠে এলেন গাড়িতে। তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, শুধু ধাঁধা! সে তো রক্ষে। মারা যে পড়েন নি এই ঢের। চারুকুটিরে থেকেছেন, রাত কাটিয়েছেন, বুড়ো মালির হাতের রান্না খেয়েছেন। ওরে বাপ! শুনেই মাথা ঘুরছে মশাই। ... ওই তো সামনে। ওই ঝোপঝাড় জঙ্গল গজানোর মধ্যে সামনের গেট। আমায় এখানেই নামিয়ে দিন মশাই। আর যাচ্ছি না।

প্রায় চলন্ত গাড়িটা থেকে নেমে পড়ে ভদ্রলোক উল্টোমুখো চোঁ চোঁ দৌড়তে থাকেন।

আর সপরিবার বিজয়বাবু? নীতু পিতু আর তাদের মা?

স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পান পোড়োবাড়ির লতাগুল্ম গাছগাছালির আড়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কব্জা ভাঙা গেটটার ঝুলে পড়া একটা পাল্লায় কোণ ছিঁড়ে বাঁকা হয়ে ঝুলছে কাঠের নেম প্লেটটা। কালো জমিতে সাদা দিয়ে লেখা।

'চারুকুটির'।

এ কে খাসনবীশ!

নিচে একটা তারিখ রয়েছে যেটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এবং এই খানিক আগে যেটা দেখে নীতু বলেছে বাপী, উনিশশো কত? গেটের ফাঁক থেকে সেই নাক খ্যাঁদা হাত ভাঙা ফাটাচটা পরী-পুতুলটা দেখা যাচ্ছে। সকালের রোদে ভরা আকাশ। দেখে বুঝতে ভুল হয় না এ বাড়িতে বহুকাল মানুষের পা পড়েনি।

নীতু মাথা উঁচু করে ওপর দিকে তাকালো। দোতলার ঘরটা দেখা যাচ্ছে। আগাছার জঙ্গল অতটা পর্যন্ত উঠতে পারেনি। কার্নিশ ভাঙা, খড়খড়িটার একটা জানলার পাল্লা হাট করে খোলা। ওই ঘরটায় বসেই না তারা কাল রাত্রে তাসের ম্যাজিক দেখছিল।

— দিদি! দেখছিস

— কী দেখবে দিদি?

আচমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। আর সাঁই সাঁই করে মুঠো মুঠো শুকনো পাতারা সেই জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। কিন্তু ওগুলো কী গাছের পাতা? না তাসের সাহেব বিবি গোলাম টেক্কার দল?

কিভাবে কোন পথে গাড়ি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে আসতে পেরেছেন বিজয়বাবু তা তিনিই জানেন। বিজয়গিন্নী তো সারা রাস্তা কপাল

চাপড়েছেন, তাঁর রাশি রাশি শাড়ি ভরা সুটকেসটা আর গাদা জিনিস সেই ভূতের বাড়িতে পড়ে রইল। আর পিতু নীতু মাঝে মাঝেই ডুকরে উঠছে, ও বাপী! আমরা যে ভূতের হাতে খেলাম। আমাদের কী হবে? ও বাপী সেই মোগলাই পরোটা, চিংড়ির কারি যে আমাদের পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে।

বাপী বললেন, রাতদিন কত ভুতুড়ে জিনিস আমাদের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তার হিসেব জানিস? এই যে লোকজন সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কে মানুষ আর কে ভূত কে জানে?

যাক একটা জিনিস বেঁচেছে। সেটা হচ্ছে ক্যামেরা। গাড়িতেই ছিল। কিন্তু গাড়ির পেছনে এসব কোথা থেকে এল? নীতুদের মার সেই শাড়ির সুটকেস, বাক্স, বিছানা, ব্যাগ ব্যাগেজ। ... কে কখন রেখেছিল এর মধ্যে?

একটি জিনিসও খোয়া যায়নি। মায় বিজয়বাবুর সিগারেট কেসটা পর্যন্ত। সব কিছু সযত্নে রাখা রয়েছে।

সেসব নামাতে নামাতে বিজয়বাবু গম্ভীরভাবে বলেন, বুঝতে পারছ জগতে কে মানুষ কে ভূত বোঝা শক্ত। যার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' থাকে সে মরে ভূত হয়ে গিয়েও মনুষ্যত্ব বজায় রাখে। এখন বল গ্যাংটকের বদলে গানুডি গিয়ে তোমাদের লোকসান হল? না লাভ হল?

নীতুরা দু ভাইবোনেই চেঁচিয়ে উঠল, লাভ লাভ। আর কেউ কখনো আমাদের মত ভূতের সঙ্গে থেকেছে? ভূতের হাতে খেয়েছে? কপালে লেখা না থাকলে এমন হয়? আহা — বন্ধুরা কি বিশ্বাস করবে?

কিন্তু পল্টুকাকাও কী?

না কি ওঁর চলে যাওয়াটা ওঁর স্বভাবগত খেয়ালীপনা? কে বলতে পারে আবার হঠাৎ কোনদিন কোথাও উদয় হয়ে বলে উঠবেন, কি রে নীতু চিনতে পারিস?

মাঝরাতের কল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এবছর, তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠান্ডা অত্যন্ত বেশী পড়েছিল। পুরুপুরু গোটা কতক গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল ঠান্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভিতরে গিয়ে ঢুকছে।

আসছিলাম আমার পুরনো মোটরে। এ মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভাল হত। এই দারুণ শীতে ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ান। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু জমাট বাঁধেনি। অনে সময় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোন যোগ নেই।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটিও অত্যন্ত নির্জন। দুধারে মাঝে মাঝে হরতুকি বা মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি ঘর নেই বল্লেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জন জায়গায়।

অন্ধকারে অবশ্য এ সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কেটে চলেছি কোনরকমে।

শীতের দরুণ কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিলাম। আমার কারটি পুরান হলেও মজবুত। বেয়াড়াপনা সে করে না। আধ ঘন্টার মধ্যেই বাড়ি পৌছে

গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুত গতিতে। নিজেকে যথা সম্ভব আবৃত রেখে ভেতরে বসে সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মত পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল, একবার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে প্রাণের দায়ে ছাড়া শুধু পয়সার জন্যে আর আমায় কেউ বার করতে পারবে না। এখন কোন রকমে কুড়ি পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। আমার একান্ত সুস্থ সবল মোটর থেকে থেকে অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। মোটরের এ রকম আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভাল রকম সেবা শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোন রকম রোগের আভাষ তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এ রকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কি।

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপনায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনও প্রায় সাত আট মাইল পথ বাকী। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কি? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্য এবার নিজের উপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরো বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। মোটর চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না। কাৎরাতে কাৎরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না। কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি করে ওঠা ছাড়া আর কোন সাড়া সে দিল না।

ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাবার কথা তো কল্পনা করা যায় না। এই মাঠের মাঝে মোটরে সারা রাত কাটানও অসম্ভব। এখন উপায়।

"ডাক্তারবাবু!"

হঠাৎ বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই জনশূন্য পথে এমন

সময়ে কে ডাকল?

আবার শুনতে পেলাম "ডাক্তারবাবু!"

এদিক ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার দেখতেও পেলাম। পথের ধারে ঝাঁকড়া একটি গাছের পাশে আবছা একটি দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন জায়গায় কেমন করে সে উদয় হল বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম, "কে! কে তুমি?" মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমন বিস্ময়করই হোক না কেন, লোকটার কাছে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা তো আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে, 'আমায় চিনবেন না আপনি।'

চেনবার জন্য আমি তখন ব্যস্ত নই। আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটা আবার বললে, "আপনাকে একটু আসতে হবে ডাক্তারবাবু! ভারী অসুখ একজনের!"

এমন সময়ে এ অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম আশ্চর্য হলামও তেমনি। ঠিক এই সময়ে রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রুগী কি আমার জন্য তৈরী হয়ে বসেছিল!

লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ করে বললে, " এ ভগবানের দয়া ডাক্তারবাবু! এমন সময় আপনাকে এখানে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি, অথচ না পেলে কি বিপদই যে হত!"

বেশী কথাবর্তা তখন আর ভাল লাগছিল না। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম "কোথায় তোমার রুগী?"

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করল। সেদিকে চেয়ে দেখলাম সত্যি দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এ রকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এ রকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এ রকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকা কড়িও নিতান্ত সামান্য এই যা ভরসা!

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কি অসুখ?"

উত্তর এল "জানি না ডাক্তারবাবু, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধহয় বাঁচান যাবে না। দোহাই আপনার, চলুন ডাক্তারবাবু!"

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝ রাত্রে যেতে হবে

পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ — জীবন মরণের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বললাম 'চল।'

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটু পথ। অন্ধকারে ভাল করে দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে দেখিয়ে লোকটা বললে, "ওই ঘরেই রুগী বাবু, আপনি যান, আমি এখনি আসছি।"

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ চেহারার নয়। গুটি চার পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠান। ঘরগুলিও সব পাকা ছাদের নয়, দু পাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথা মত সামনের ঘরে এবার গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাক্স পেঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটি জানালা। সেই জানলার ধারে মিটিমিট করে একটি কেরাসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, দরজার বাঁ ধারে একটি চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন, "এসেছেন ডাক্তারবাবু। আপনার দয়া কখনও ভুলব না, বসুন।"

ঘরের ভিতর এদিক ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই দেখতে পেলাম। জানালার কাছে গিয়ে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে আসবার উদ্যোগ করতেই ভদ্রলোক আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, "বসুন বসুন এইখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি শুনুন।"

একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রুগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম, খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন, "আমার রোগ সারাতে আপনি পারবেন না ডাক্তারবাবু। বাঁচাতে পারেবেন ডাক্তারবাবু?" একটু হেসে বললাম, "সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ। আর বাঁচবেন নাই বা কেন?"

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে "বাঁচতেও পারি ডাক্তারবাবু

কেমন?"

বললাম, "পারেন বই কি। কি তেমন আর হয়েছে আপনার?"

"না তেমন আর কি হয়েছে!" ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন, তারপর বললেন, "ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা কেমন না! কিন্তু ধরুন তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই?"

রোগীর এই অর্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কি যে বলবো কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বে অস্থির হয়ে উঠছি।

রোগীই আবার বললেন, "যদি আপনি থাকতে থাকতেই মারা যাই ডাক্তারবাবু, কি হবে তাহলে? কে আপনার 'ফী' দেবে?"

আচ্ছা পাগল রোগীর পাল্লায় তো পড়া গেছে। বললাম, "যদি নেহাৎই তাই হয়, তাহলে 'ফী' নাই পেলাম। আমরা শুধু ফীর জন্যই সব সময়ে আসি না।"

"তা বটে তা বটে" পৃথিবীতে ভাল লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব এখনও আছে, তাই না ডাক্তারবাবু। কিন্তু আপনার ফীর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি ডাক্তারবাবু! হঠাৎ যদি মরে যাই ওই বাক্স খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন ডাক্তারবাবু — ওই বেতের ছোট্ট বাক্সটি!"

ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এল "ওই বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন। আরও একটা জিনিষ নেবেন ডাক্তারবাবু! বলুন! নেবেন তো?"

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "কি?"

"কিছু না ডাক্তারবাবু একটা কাগজ। কিন্তু ভয়ানক দরকারী কাগজ। এ কাগজ ওখানে আছে শুধু আপনি আর আমি জানি। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকত না।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বললেন, " এ বাড়ীতে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাববেন না যেন আমার কেউ নেই। আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওৎ পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস আজ আমি হয়ত মরব না, তাদের বিশ্বাস মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই সব পাবে।"

আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম, "আপনার অসুখটা সম্বন্ধে —"

"হ্যাঁ, অসুখ তো দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তারবাবু। আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে তাও জানি না। কিন্তু জানেনই তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন।"

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম, "এইবার আমি দেখতে পারি!"

খাট থেকে আওয়াজ হল "দেখুন।"

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর নাড়ি দেখবার জন্যে হাতটা তুলে ধরলাম এবং পরমুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরেও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মত ঠান্ডা। রোগী মৃত! শুধু মৃত হলে এতখানি আতঙ্কের আমার বোধহয় কারণ থাকত না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা! ডাক্তারী শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে এ রোগী এইমাত্র কখনই মারা যায় নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, কয়েক ঘন্টা আগে। সমস্ত দেহ, তার কঠিন।

উন্মাদের মত আরো খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। না, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তাহলে কি এ ব্যাপারের অর্থ?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোন চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপ দপ্ করে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম তাতে তেল এক ফোঁটা নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি একা, এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল। তাও নিভতে চলেছে দেখে, আমি দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম পিছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠান ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কিভাবে তারপর অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মোটরে উঠেছিলাম তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হল, মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ এবার বিনা চেষ্টায় আপনা হতে সে মোটর এমন শুধরে গেল কি করে?

তার পরদিন দিনের আলোকে লোক সঙ্গে করে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝেকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রোগীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা আমি এখনও করতে পারিনি।

ওয়ারিশ

লীলা মজুমদার

খাঁদার আর গদাইয়ের যেমনি নামের ছিরি, স্বভাবটিও তেমনি। আমাদের এই কলকাতার উপকণ্ঠে একটা পুরনো পাড়ার আদি বাসিন্দাদের দুই বংশধর। এ গল্প চোখে পড়লে পাছে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন, তাই আর রাস্তাটার নাম বললাম না। সেখানকার সব নালা গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে, সব মোড়ে একটা করে মোটরের কারখানা। আর পথঘাটের কথাই যদি বল, সব ভাঙা, সব পথে বাস আর প্রাইভেট গাড়িতে পায়ে চলা দায়। বড়দাদামশাই নাক সিঁটকে বলেন, 'যেমন দুই গুণধর, তারি উপযুক্ত পটভূমিকাও হবে তো।' আসলে ওরা মামাতো পিসতুতো ভাই। খাঁদার বাবা এ জন্মে কোন চাকরি রাখতে পারেননি আর গদার বাবা তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের ওপর সব দায় চাপিয়ে সগ্গে গেছেন। শ্বশুরবাড়ির কেউ তাঁর নামও করে না। না করে করে এখন প্রায় ভুলেও গেছে। নিজের বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে, কোন কালে তিনি তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠেছিলেন এবং পত্রপাঠ সগ্গেও গেছিলেন। ওর মামাতো ভাই খাঁদার দিব্যি টিকলো নাক ছিল। যখন জন্মেছিল তখন নাকি ঐ নাকের জায়গাটা সাংগু ভ্যালির মত চ্যাপ্টা ছিল, উঁচু-নিচুর বালাই ছিল না। তখন ঐ দিদিমাই নাকি দুবেলা বিশুদ্ধ ঘানির তেল দিয়ে যেখানে নাক থাকা উচিত, তার দু পাশ দিয়ে চেপে চেপে ঠেলে ঠেলে মালিশ করে এমন বাঁশির মত টিকলো নাক করে দিয়েছেন। অথচ ছেলের কি তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে? মোট কথা ওদের মা-রা সুদ্ধ বাড়ির সকলেই ওদের মুখ দেখলে রেগে উঠতেন। আবার সারাদিন বাইরে থেকে সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ঢুকলেও কি নিস্তার ছিল?

বড়দাদামশাই রেগে ওদের ভাত বন্ধ করে দিলেন। বললেন তার খরচায়

কেউ টো-টো কোম্পানী খুলতে পাবে না। এতে দুই মা কিঞ্চিত ঘাবড়ে গেছিলেন। কিন্তু গদাই বলল, আরে তোমরা ভাবছ কেন? আমরা মোটর গ্যারেজে মজুরি খাটি। বেশ ভাল খাইদাই। গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কসের পেছনে একটা ঘরও পেয়েছি। সেখানেই থাকব ভাবছি। মানে ইয়ে — আমাদের আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস আছে তো। খাঁদা ওর এক বছরের ছোট এবং বেজায় ভক্ত। সেও বলল, আছেই তো।

দুই মা তাই শুনে কাষ্ঠ হেসে বললেন, তাই নাকি? তাহলে তাই করিস। আরেকটু মাইনে বাড়লে, আমাদেরও কিছু দিস।

এই তো ব্যাপার। এমন ব্যবহার পেলে কার না রাগ হয়? হাজার হোক দুজনেই.... হতে পারে টেনে-টুনে মাধ্যমিক পাস করেছে তো। কেন, গ্যারেজের কাজটা খারাপ হল কিসে? তার চেয়ে পশ্চিমাদের আপিসে কলম পেশার কাজের কি খুব বেশী সম্মান? তোদের ঐ লজ্‌ঝড়ে গাড়ি বিগড়োলে তো নিজেরা কিছুই করতে পারিস না, পয়সা দিয়ে লোক ডাকতে হয়। আমরা কিন্তু দরকার হলে অনেক কলম পেশার কাজও করতে পারি।

অবিশ্যি এ সব হল রাগের কথা। সত্যি কি আর বড়দাদামশাইকে তুই-তোকারি করে অমন বেয়াড়া কথা ওদের বলা সম্ভব হত? ওরা এগার ক্লাস থেকে পালাতে পারে, তাই বলে অভদ্র তো আর নয়। খাঁদা আরো বলল, শুনেছি তোর ঠাকুরদারা বনেদী বড়লোক ছিলেন।

এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গদাই বলল, তুই কি করে জানলি? কারখানার পেছনে দড়ির খাটিয়াতে বসে একটা প্যাকিং কেসের ওপর খুদে একটা পুরনো জনতা স্টোভে খাঁদা চার পেয়ালা জল আর দু-চামচ গুড়ো দুধের সঙ্গে এক চা-চামচ চা-পাতি আর তিন চা-চামচ চিনি মিশিয়ে ফুটোচ্ছিল। চা-পাতি একটা ছেঁড়া রুমালে বেঁধে নিয়েছিল বলে ছাঁকনি-টাকনির দরকার ছিল না। ক্যান্টিনের পরিত্যক্ত দুটি হাতলবিহীন মগে ঢেলে খাওয়া হবে। সোঁদা সোঁদা গন্ধওয়ালা এক রকম মিষ্টি পাঁউরুটির সঙ্গে। এক টাকায় চারটে মাঝারি মাপের পাওয়া যায়।

খাঁদা বলল, মা বলছিল পিসিকে, তাঁদের চিঠি লিখে আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে। তাই শুনে মহা রেগে গদাই তোৎলামি করতে লাগল, ক্‌-কেন? আমরা ক্‌-কি ভিকিরি না কি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত? তুই দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলি না কেন?

খাঁদা বলল, না, মানে ভিকিরি বনবি কেন? তোর পৈত্রিক সম্পত্তিতে তো

তোর ন্যায্য অধিকার-ই আছে!

কথাটা মন্দ বলেনি খাঁদা, তবে একটা অসুবিধেও আছে। ঠাকুরদার নামধাম কিছুই জানে না, তা খবর করবে কোথায়? এ-কথা বলতেই, খাঁদা পকেট থেকে একটা আধময়লা কাগজের টুকরো বের করে বলল, মা পিসিকে ঐ সবই জিজ্ঞাসা করলে পিসি বলেছিল তোর বাবার নাম অসিতবরণ আচার্য, ঠাকুরদার নাম অম্বিকাচরণ আচার্য। ওঁদের জমিদারি ছিল জলপাইগুড়ির কাছে নীলাম্বুনিধি বলে একটা বড় পরগণায়। তার অনেকটা জঙ্গলে ঢাকা ছিল। আমি নামগুলো টুকে রেখেছিলাম।

গদাই খানিক ভেবে বলল, না রে, মন চাইছে না। বাবাকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওদের সাহায্য নিতে অপমান লাগে।

খাঁদা বলল, তাড়ায়নি মোটেও। বন্ধুর জাহাজ কোম্পানীর শেয়ার কেনবার জন্য বাপের কাছে পিশেমশাই এক লাখ টাকা চেয়েছিলেন। বাপ দেননি। বলেছিলেন আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি দরকার র‍্যা। তাতে রেগেমেগে চলে এসে তোর মায়ের গয়না-গাটি বেচে, শেয়ার কিনে, দেউলে হয়ে, শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠে পিসেমশাই দেহ রাখলেন।

খাঁদার জ্ঞানের প্রসার দেখে অবাক হয়ে গদাই বলল, হুট করে কিছু বলতে পারছি না। একটু ভাবা দরকার।

খাঁদা বলল, অবিশ্যি তা না করে, এখানে, কিম্বা এই রকম আরেকটা কোথাও, এইভাবে জীবন কাটানোও যায়। এই বলে ভাঙা মগে চা ঢালতে লাগল।

বেশি ভাববার সময় পায়নি গদাই, কারণ ঠিক সেই সময়ে, একটা বাংলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে কারখানার মালিক পার্বতীবাবু, গ্যারেজের দিকের টিনের দরজাটা ক্যাঁচ করে খুলে ঘরে ঢুকলেন। গদাই তাঁকে আস্ত খাটিয়াতে বসতে দিয়ে বলল, এ চা আপনি খেতে পারবেন না, দাদা।

পার্বতীবাবু বললেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি চা খাই না, জলখাবার খেয়ে এসেছি। কাগজে কি লিখেছে শোন ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় নীলাম্বুনিধির কাঠ ব্যবসায়ী অম্বিকাচরণ আচার্যের দ্বিতীয় পুত্র অসিতবরণ, কিম্বা তিনি গত হয়ে থাকলে তাঁর উত্তরাধিকারী কেউ যদি থাকে, তিনি পত্রপাঠ নিম্নলিখিত ঠিকানায় উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলে লাভজনক কোন সংবাদ পেতে পারেন। নিজের পরিচয়ের প্রমাণস্বরূপ কিছু কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে। —গদাই, তোমাদের কাজ দেবার আগে তোমার মামার বাড়ি থেকে যা জেনে

এসেছিলাম, তাতে মনে হচ্ছে অসিতবরণ আচার্যের একমাত্র সন্তান অলোকশরণ তুমি, তাই ঠাকুরদার সম্পত্তির কিছুটা পাবে। ঐ যে নাম ঠিকানা দেওয়া আছে, ওঁরা তাঁদের উকিল। গিয়ে একবার খবর করলে ভাল হয়। কারণ কারখানায় আমার জামাইকে একটা চাকরি না দিলেই নয়। অর্থাৎ ওদের চাকরিটা গেল।

এরপর আর কথা নয়। বড়াদাদামশাই নিজেই লোক পাঠিয়ে দুজনকে ধরিয়ে নিয়ে গেলেন।

কি হে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে মনে হচ্ছে। দুজনে গিয়ে একবার দেখেই এসো না। তবে খুব বেশি আশা কর না। অনেকগুলো ওয়ারিশ। জঙ্গল কেটে কেটে কাঠের ব্যবসা করত বুড়ো। তার কি আর খুব বেশি বাকি আছে। তবে মস্ত বাড়ি, মন্দির, অতিথিশালা, দেদার গুদামঘর দেখেছিলাম।

গেল দুজনে প্যাসেঞ্জার গাড়িতে, সেকেন্ড ক্লাসে, কারণ থার্ড ক্লাস তো কবে উঠে গেছে। কি ভাগ্যে বড়দাদামশাই দুজনার জন্যে দুটো করে মোটা নীল পেন্টেলুন আর লম্বা হাতা গরম সোয়েটার কিনে দিয়েছিলেন। স্টেশন থেকে অর্ধেক পথ বাস যায়। সন্ধ্যাবেলায় একটা বনের ধারে ওদের নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলল, বনের মধ্যে দিয়ে দশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। টর্চ আছে আশা করি, কারণ বুনো জানোয়ার যে একেবারে নেই তা নয়। ওদিকটা বুড়ো কেটে সাফ করেছিল, সব জন্তু একদিকে জড়ো হয়েছে। চোরা-কারবারিদের পোয়া বারো।

বাস চলে গেলে চারদিকটা যেন বড় বেশি অন্ধকার বলে মনে হতে লাগল। ক্রমে সেটা চোখ সওয়া হয়ে গেল, তারার আলোয় ওরা পথটা স্পষ্ট দেখতে পেল। টর্চের ব্যাটারি খরচ করতে হল না। হয়তো ঘন্টা দুই হেঁটেছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কখন থেমেও গেছে। তারি মধ্যে কানে এল কান্নার মত একটা শব্দ। কেউ কষ্ট পাচ্ছে, এ ওরা সইতে পারত না। তাড়াতাড়ি হাঁটা পথ ছেড়ে টর্চ জ্বেলে বনের মধ্যে ঢুকে, একটু এগোতেই একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। গাছতলায় কে একটা ছোট জানোয়ার ধরার দাঁত-কল পেতে গেছে আর তাতে অদ্ভুত ফিকে প্রায়-রুপোলী রঙের শেয়ালের একটা পা ধরা পড়েছে। সে করুণভাবে চারিদিকে চাইছে আর মানুষের ছেলের মত কাঁদছে। তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছাই রঙের শার্ট প্যান্ট পরা, সাদা দাড়িওয়ালা একজন বুড়ো মানুষ কাতরভাবে তাকিয়ে আছেন। মনে হল বোধহয় পঙ্গু, তাই নিজে কিছু করতে পারছে না।

ওদের কিছু বলতে হল না। ছুটে গিয়ে ফাঁদের দাঁত খুলে শেয়ালটাকে ছেড়ে দিতে ওদের দু-মিনিটও লাগল না। আশ্চর্যের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে পালাল না। পোষা কুকুরের মত ওদের গা ঘেঁসে, মুখ চেটে দিল। ওরা উঠে পড়লে তবে বনে ঢুকে পড়ল।

গদাই, খাঁদা বুড়ো মানুষটির দিকে চাইল। তিনি একটু একটু হাসছিলেন। তারপর বললেন, তুমি আজ একটা ভাল কাজ করলে, তোমার নাম অলোকশরণ, অসিতবরণের একমাত্র সন্তান তুমি। অসিত ভাল ব্যবহার করেনি, মনের দুঃখে তার মা অকালে মারা যান। উইলে তোমাকে সব চাইতে পুরনো বড় গুদোম ছাড়া কিছু দেওয়া হয়নি। অপমান বোধ করে সেটি নিতে অস্বীকার কর না। ওর মধ্যে যা আছে তার মূল্য তোমরাই বুঝবে। সুখী হয়ো দুজনে।

এই বলে বুড়ো এমনি হঠাৎ বনের অন্ধকারে ঢুকে গেলেন যে মনে হল বুঝি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। ওরা এ-ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, আবার হাঁটা ধরল। ভোরের আগে পাহাড়ের কোল ঘেঁসা নীলাম্বুনিধির কুঠিবাড়িতে ওরা পৌঁছেছিল। ওদের আগেই কলকাতার উকিলমশাইও সেখানে পৌঁছেছিলেন। বাড়ির সকলেই গদাইয়ের নিকট আত্মীয় হলেও, ওকে পেয়ে খুব একটা আহ্লাদ প্রকাশ করেনি। বরং একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখা গেল। কলকাতায় ওরা উকিলের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানিয়েছিলেন। তিনিও প্রয়োজন মত অনুসন্ধান করে, গদাইয়ের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, তবে তাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।

বড় বাড়িতে কেউ তাদের যায়নি, প্রায় পোড়োবাড়ির মত অবস্থার অতিথিশালায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে ওরা উকিলবাবুর সঙ্গে গুদোম ঘরটার দখল নিতে চলল। তিনি হেসে বললেন, এ ঘরটিতে যত রাজ্যের পুরনো ভাঙাচোরা মোটর গাড়িতে ঠাসা। বুড়োর ঐ এক শখ ছিল, যাকে বলে মোটরগাড়ি পাগল। ঐ ঘর আর তার মধ্যে যা কিছু ভাঙাচোরা ধনসম্পদ আছে, সবটার মালিক এখন তুমি।

এই বলে হাসতে হাসতে গুদোমের মস্ত লোহার দরজা খুলে দিলেন। আগে এটাই যে প্রকাণ্ড গ্যারেজ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু ঠাকুরদা কেন, গদাইরাও গাড়ি পাগল, খাঁদাও।

দরজাটাকে হাট করে খুলে দিতেই ঘরটা সকালের আলোয় ভরে গেল। আর গদাই খাঁদা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখল যে প্রথম দিককার ছাদখোলা ফোর্ড গাড়ি

থেকে আরম্ভ করে দশ বারোটা বিখ্যাত বিদেশী গাড়ির কোনটা কম কোনটা বেশি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। আর সবার পেছনে চাটাই-চাপা যেটা ছিল, সেটার ওপরকার চাটাই সরাতেই একটা হয়তো ১৯১০ সালের রোলস রয়েস অক্ষত দেহে ঝকমক করতে লাগল।

তাই দেখে দুজনার মাথা ঘুরে গেল। তারা টলতে টলতে দুটো গাড়ির ধুলোয় ঢাকা ফুটবোর্ডে ধপাধপ বসে পড়ল। এর জন্য উকিলবাবুও প্রস্তুত ছিলেন না। বুড়ো নাকি এদিকে কাউকেই আসতে দিতেন না। নিজের লোক দিয়ে গাড়ির কাজ করাতেন।

উকিল বললেন, বাবা, আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। তোমার বাবা আমার ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন।

গুদোমে আরেকটা জিনিস ছিল। দেয়ালের দিকে মুখ করা একটা বড় রঙীন ফটো। সেটা ঘুরাতেই দেখা গেল বনে দেখা সেই বুড়ো মানুষ আর তাঁর কোলে বসা সেই সাদা শেয়াল। উকিল বললেন, ইনি তোমার ঠাকুরদা। সাদা শেয়ালটাকে বনে কুড়িয়ে পেয়ে পুষেছিলেন।

এদেশে সাদা শেয়াল হয়না, ওটা অ্যাল্‌বিনো নয়, তবু ফিকে রং। তোমার ঠাকুরদা যেদিন মারা গেলেন, শেয়ালটা বনে পালিয়ে গেল। যাই হোক এই গুদামে লাখ লাখ টাকার জিনিস আছে। কাজে লাগিও।

খাঁদাও মন দিয়ে সব কথা শুনছিল, কিন্তু গদাই শেষটা কেন মুচ্ছো গেছিল, তা উকিলবাবু বুঝে উঠতে পারেননি। খাঁদা পেরেছিল।

তান্ত্রিক

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দুর্গাবিনোদ ইস্কুল মাষ্টারের ছেলে। অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে এম-এ পাশ করলেও মুরুব্বির অভাবে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারল না। শেষ অবধি হলো কেরানী। এখনকার দিনে কেরানীগিরির আবার দুটো ভাগ হয়েছে, নীচু কেরানীর মাইনে হয় সওয়া শো থেকে শুরু, আর উঁচু কেরানীর মাইনে শুরু হয় সওয়া দুশো টাকা থেকে। মুরুব্বিহীন দুর্গাবিনোদ নীচু ধাপের কেরানী হলো। তাও জুটলো অনেক কষ্টে। এম-এ পাশেও কুলোয়নি। এই কেরানীগিরির জন্য আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

যাক চাকরিটা হয়ে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান তো হলো। দুর্গাবিনোদের পড়াশুনার শখ আছে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সে লাইব্রেরীতে হাজিরা দিয়ে চলল, রাত ন'টা অবধি। দর্শনশাস্ত্রে সে এম-এ পাশ করেছে, এবার হিন্দু দর্শনটা সে ভালভাবে বুঝে নিতে চায়।

ধর্ম কী ? ঈশ্বর কী ? মানুষ কেমন করে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ? এই বুঝতে বুঝতে শেষে এসে পড়ে যে সব সাধু সন্ত মহাত্মা সাধনা করতে করতে ভগবদ্-শক্তি লাভ করেছিলেন তাঁদের কথা। ভারতের সাধকদের যত সব অলৌকিক কীর্তির কথা পড়তে পড়তে দুর্গাবিনোদ সাধু দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। রবিবারে ছুটির দিনে তার আর বাড়ীতে বসে থাকা চললো না। কলিকাতার আশেপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোথায় কোন্ আশ্রম আছে, কোথায় কোন্ তান্ত্রিক থাকেন, সেখানে সে যাওয়া আসা শুরু করলো।

দুর্গাবিনোদ আশ্রমে যায়, আরো দশ জনের মাঝে বসে, আশ্রমিক মহাত্মাদের বাণী শোনে, তারপর প্রণাম করে বিদায় নেয়। ফেরার পথে মহাত্মার বাণী মনে

মনে আলোচনা করে, মহাত্মা কত বড় সাধক তার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করে। মহাত্মার কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা জানার চেষ্টা করে।

একদিন খবর পেল হাওড়ার এক গ্রামে এক তান্ত্রিক আছেন তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। জলপড়া দিয়ে অম্লশূল সারান, কানে কাঠি দিয়ে কালা মানুষের বধিরতা দূর করেন, কঠিন বাতের বেদনা সামান্য হাত বুলিয়ে আরাম করে দেন।

যিনি খবরটা দিয়েছিলেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

বাস থেকে নেমে মাইল খানেক হেঁটে গেলে একটি ছোট গ্রাম। গাঁয়ের গোড়াতেই এক পুকুর পাড়ে একটি ছোট মন্দির, মন্দিরের পাশেই একখানি চালাঘর। ঘরের দাওয়ায় একজন জটাধারী সাধু বসে আছেন, সামনে ধুনুচীতে আগুন জ্বলছে, পাশে একটা কলসী ও ভাঁড়। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা হাত জোড় করে সামনে মাদুরে বসে আছে।

দুর্গাবিনোদও বসে পড়লো।

সাধুর বয়স বেশী নয়, তার চেহারা বলিষ্ঠ, রং কালো, মাথার জটাও বিশেষ দীর্ঘ নয়। চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল। তার উপর কপালে লাল চন্দন লেপা। ভক্তির চেয়ে ভয় হয় বেশী।

দুর্গাবিনোদের দিকে নজর ফেলতেই সে হাত জোড় করে প্রণাম জানালো। সাধু নিজে থেকেই বললেন — কী চাই? গুরু? গুরু মেলা অত সহজ নয়, আগে নিজেকে তৈরী কর, তারপর গুরু। পাত্র ফুটো হলে জল রাখবি কেমন করে? আধার ঠিক না হলে মন্ত্রশক্তি ধারণ করবি কেমন করে? সে মন্ত্র যে দেবে তার কোন লাভ নেই, যে নেবে সেও ব্যর্থ হবে। তৈরী হ'।

দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল। বললো — কিভাবে তৈরী হতে হবে?

— বাক্ সংযম কর, বেশী কথা বলবি না। নিরামিষ আহার করবি। অযথা কোন পরিশ্রম করবি না, শক্তি সঞ্চয় করবি। সন্ধ্যার পর কোন মন্দিরে বা গঙ্গার তীরে চুপ করে ঈশ্বরের ধ্যান করবি। ধীরে ধীরে মন আত্মস্থ হবে, চিত্ত দৃঢ় হবে। তখন গুরুমন্ত্র নিয়ে সাধন-ভজনের কথা উঠবে, তার আগে কিছু হবে না।

দুর্গাবিনোদ এতদিনে যেন একটা আলো দেখতে পেল। গুরু ও মন্ত্রের কথাটা সে ভেবেছে, কিন্তু এমন ভাবে তার হদিশ কেউ তাকে বাতলাতে পারেনি। তান্ত্রিকের উপর তার বিশ্বাস হলো। প্রথম দর্শনেই এমনভাবে মনের কথাটা টেনে বলা সহজ নয়।

বিকাল অবধি দুর্গাবিনোদ কালীবাবার সামনে বসে রইল। অবধূত কালীবাবা আর তার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। কলসী থেকে ভাঁড়ে মদ ঢালেন আর খান। আর অসুস্থদের রোগের কথা শোনেন। প্রত্যেক জনকে ওষুধও দেন। ওষুধ মানে কাউকে ধূনির ছাই, কাউকে ধূপের আধপোড়া কাঠি। —এই ছাইটা তিন ভাগ করে তিন দিন সকালে খালি পেটে খাবি। — এই কাঠিটা একটা তামার মাদুলিতে ভরে ধারণ করবি ইত্যাদি।

বিকেলবেলা দুর্গাবিনোদ প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়লো। কালীবাবা একবার তাকিয়ে হাসলেন শুধু।

দুর্গাবিনোদ অনেক আশ্রমে ঘুরেছে, অনেক মহারাজকে দর্শন করেছে, দিনের পর দিন অনেকের উপদেশ-বাণী শুনেছে। কিন্তু কালীবাবার মতো অলৌকিক ক্ষমতা কারও দেখেনি। ছাই দিয়ে রোগ সারানো, কানে কাঠি দিয়ে বধিরতা আরাম করা, হাত বুলিয়ে বাতের বেদনা মুক্ত করা — এসব বড় কম শক্তির কথা নয়। এই মানুষটি কিছুটা ঐশ্বরিক শক্তি যে আয়ত্বে এনেছেন — একথা মানতেই হবে। দুর্গাবিনোদ কালীবাবার কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করলো। যদি ইনি প্রসন্ন হয়ে কৃপা করেন, তাহলে দুর্গাবিনোদও একদিন কৃতার্থ হবে।

কালীবাবা সেই যে প্রথম দিন কথা বলেছিলেন, তারপর থেকে আর কথাই বলেন না। প্রণাম করলে হাসেন আর হাত তুলে বলেন — জয়স্তু।

দুর্গাবিনোদ এদিকে নিরামিষ খাওয়া শুরু করেছে, কথা কম বলে, অনর্থক কোন ঘোরাফেরা করে পরিশ্রম করে না। রাত বারোটা অবধি বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কালীবাবার কথা মতো নিজেকে সে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলেছে।

হঠাৎ একদিন মাস ছয়েক পরে কালীবাবা বললেন — তুই তো রবিবারে আসিস, আসছে শনিবারে আয় না। সেদিন অমাবস্যা, রাতে মায়ের পূজো দেখবি।

— এ তো আমার সৌভাগ্য।

— সন্ধ্যায় চলে আসবি। রাতে এখানে থাকবি। সারা রাত জাগতে পারবি তো? আমি সারা রাত পূজো করি।

— একটা রাত তো।

— তাহলে আসার সময় মায়ের পূজো নিয়ে আসিস।

— কী আনতে হবে বলুন?

— তুই আর কী আনবি? তিন বোতল দেশী মদ আনবি। কারণবারি —

তাতেই হবে।

কালীবাবা গুণগুণ করে উঠলেন — মদ খাই মা কালী বলে — তারপর কলসী থেকে এক ভাঁড় মদ নিয়ে গলায় ঢাললেন।

দুর্গাবিনোদ সেদিন খুশি হলো। কালীবাবা মদ চেয়েছেন। পূজো দেখার জন্য ডেকেছেন। এবার তিনি প্রসন্ন হবেন। উৎফুল্ল মনে দুর্গাবিনোদ সেদিন বাড়ী ফিরলো।

শনিবার সন্ধ্যায় এক রেশন ব্যাগের মধ্যে তিন বোতল দেশী মদ নিয়ে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার আশ্রমে এলো, তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কালীবাবা দাওয়ায় বসেছিলেন, বললেন — এনেছিস? দে—

বোতল তিনটি নিয়ে কালীবাবা মন্দিরে চলে গেলেন, বললেন — দু ঘন্টা এখন বোস, পূজোর সময় আমি তোকে ডাকবো।

মাদুর পাতা ছিল, দুর্গাবিনোদ সেই মাদুরের ওপর উঠে বসলো।

ক' মিনিট বসে থাকার পরেই দুর্গাবিনোদ বুঝলো রাতের অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকার মতো স্থান সেটা নয়। কানের পাশে মশার ডাক আর থামতে চায় না। বুদ্ধি করে দুর্গাবিনোদ রেশনের থলির মধ্যে একখানা চাদর এনেছিল। এবার সেই চাদরখানা দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দিল। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে রইল। তবু মনে হয় যেন মশা কামড়াচ্ছে।

সামনে অন্ধকার, মাঠ ঘাট গাছপালা সবই কালোয় মিশে গেছে। অনেকটা তফাতে দু-তিনটে ঘরের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি মানুষ আছে বলে মনে হয় না। কালীবাবার এই ঘরখানাতেও কেউ থাকে না। তাঁর পরিজনরা থাকে ওই গ্রামে। এখানে কালীবাবা একা থাকেন, সাধন-ভজনের জন্য। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। চারিপাশে নিঝুম। এই তো সন্ধ্যা হয়েছে, এরই মধ্যে মনে হয় রাত যেন দুপুর হয়ে গেল।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে।

কালীবাবাও তো মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

পাশে একজন কথা বলার মানুষ থাকলে ভাল হতো। বড় একা একা মনে হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে দুর্গাবিনোদ ঝিমুতে শুরু করে।

দুর্গাবিনোদ কোন এক সময় বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল। সহসা ঘুম ভাঙলো কালীবাবার ডাকে — আয় উঠে আয় — এবার মায়ের আরতি হবে।

ধড়মড় করে উঠে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার অনুসরণ করলো।

মন্দিরের মধ্যে পিদিম জ্বলছে। ধূপধূনায় অন্ধকার। ছোট প্রতিমাটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সামনে কিছু জবা ফুল, আর মদের তিনটে বোতল। কালীবাবা আসনে গিয়ে বসলেন, বললেন — তুই দরজার বইরে বোস।

দুর্গাবিনোদ বইরে বসে পড়লো।

কালীবাবা ওঁ হ্রীং বলে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করলেন। মাঝে মাঝে জবা ফুল তুলে প্রতিমার চরণে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক এইভাবে পূজা করার পর হাঁক দিয়ে উঠলেন — মা কালী করাল-বদনা-লোল-জিহ্বা মা—

তারপর পঞ্চপ্রদীপের আরতি শুরু করলেন।

এবার প্রদীপের আলোয় ধোঁয়ার মাঝেও কিছু কিছু নজরে পড়তে লাগল। দুর্গাবিনোদ দেখলো ঘরের মধ্যে দরজার পাশে আরেকজন কে বসে আছে। ও কে? কখন এলো?

পঞ্চপ্রদীপ ঘুরতে ঘুরতে আলোটা যখনই সেদিকে পড়ে দুর্গাবিনোদ লোকটির মুখের পানে নজর করে। কি বিশ্রী ফ্যাকাশে মুখ, যেন মড়ার মতো।

আরতি শেষ হয়। শাঁখ বাজিয়ে কালীবাবা বসলেন। মদের তিনটি বোতল মায়ের চরণে স্পর্শ করিয়ে হাঁক দিলেন — মা কালী করাল-বদনা ... লোল-জিহ্বা মা—

তারপর বললেন— প্রণাম কর — প্রসাদ নে —

দুর্গাবিনোদ প্রণাম করলো।

বোতল থেকে এক ভাঁড় মদ ঢেলে কালীবাবা বসে থাকা সেই লোকটির মুখে ধরলেন, বললেন — খাও ।

লোকটি মদ খেলো।

কালীবাবা সেই ভাঁড়ে আবার মদ ঢাললেন। তাকে বললেন — ধরো, ওকে দাও—

লোকটি ভাঁড় ধরলো, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল দুর্গাবিনোদের দিকে।

মানুষের হাত যে এতটা লম্বা হয়, দুর্গাবিনোদ তা জানতো না। ভাঁড় শুদ্ধ হাতখানা সোজা দরজা পার হয়ে চলে এলো তার মুখের কাছে।

দুর্গাবিনোদ থ'।

— ভয় পাসনি, খা, মায়ের প্রসাদ — কালীবাবা বললেন।

দুর্গাবিনোদ তাকিয়ে দেখলো। হাতখানায় কোথাও এতটুকু মাংস নেই, সবটাই কঙ্কাল। হাতের মালিকের পানে তাকালো — মুখ কই, কঙ্কালের

করোটি!

দুর্গাবিনোদের সারা দেহ কেঁপে উঠলো। — না না বলেই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই সে ছুটলো। সোজা পথ দিয়ে সে ছুটলো। কানে এল পিছনে কে যেন অট্টহাসি হাসছে।

সেই অন্ধকার পথে পুরো দু'মাইল ছুটে এসে দুর্গাবিনোদ থামলো একেবারে বাজারের মধ্যে। তখনও সকাল হতে অনেক দেরী। ভয়ে ভয়ে সে পিছন পানে তাকালো, পিছনে কেউ আসছে কিনা।

বাজারে অনেক ঘরের দাওয়ায় মানুষ শুয়েছিল। তাদের দেখে দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল। একটা দোকানের দাওয়ায় সে বসে পড়লো।

পরক্ষণেই মনে হলো সেই হাতখানা তার মুখের সামনে মদের ভাঁড়টা যেন এগিয়ে ধরেছে। দুর্গাবিনোদ চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

... ...

সকালে বাজারের লোকেরাই দুর্গাবিনোদকে বাসে তুলে দিয়েছিল।

... ...

ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে ক'দিন তার সময় লেগেছিল।

বোধহয় লোকটা ভূত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তখন আমি রেলে কাজ করি। দক্ষিণপূর্ব রেলের নাম তখন ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, সংক্ষেপে যাকে বলা হতো বি এন আর। আমাকে প্রায়ই লাইনে বেরতে হতো, হিসাব তদারকির কাজে এ অফিস সে অফিস ছুটতে হতো, কখনো বা বড় বড় স্টেশনেও হাজির থাকতে হতো।

রাত নেই, দিন নেই — খবর এলেই হলো, হুট করে বেরিয়ে পড়ো, ট্রেন যদি সে সময় না থাকে মালগাড়ীর শেষে গার্ডের কামরায় চেপে চলো, সে অধিকার আমাদের ছিল।

ব্রাঞ্চ লাইনে প্যাসেঞ্জার গাড়ী কম, সেখানে লাইনের যে কোন চলন্ত গাড়ীতে সে শুধু খালি ইঞ্জিন হোক, বা মালগাড়ী কিম্বা ব্যালাস্ট ট্রেন হোক আমাদের তাতে ওঠার অনুমতি পত্র সঙ্গে থাকতো।

এই রকমের কর্ম জীবনের কিছু বৈচিত্র্য আছে, বিবিধ ধরণের বিস্ময়কর ঘটনা চাকরির একঘেয়েমিতে ভারি মিষ্টি একটা প্রলেপ বুলিয়ে দিত। আমি এখানে তোমাদের কাছে আজ ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ করবো।

আমাকে যেতে হবে বিলাসপুরে, যাচ্ছি চক্রধর থেকে বোম্বে মেলে, হাওড়া থেকে যে বোম্বে মেল সন্ধ্যার দিকে ছাড়ে, সেটা চক্রধরপুরে যায় — ধরো রাত বারটোর পর, মাঝে থামে শুধু খড়গপুর আর টাটানগরে। চক্রধরপুরে মিনিট দশেক দাঁড়িয়েই ফের ছুট দেয়, দাঁড়ায় গিয়ে একশো কিলোমিটারের পর রাউরকেল্লা স্টেশনে। তারপর গোটা তিনেক স্টেশনে থেমে ভোরবেলা যায় বিলাসপুরে।

যখনকার কথা বলছি — তখন ছিল শীতকাল। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ঐসব অঞ্চলে শীত পড়ে। মনে হচ্ছে সেই সালটা ছিল ১৯৪৩ — তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ভারতের সর্বত্র সৈন্য চলাচলের শেষ হয়নি, লাইনে লাইনে প্যাসেঞ্জার গাড়ী কমিয়ে শুধু মিলিটারি স্পেশাল চালানো হচ্ছে। হাওড়া থেকে নাগপুর পর্যন্ত যেতে তখন মাত্র দুটো গাড়ী, বোম্বে মেল আর নাগপুর প্যাসেঞ্জার। মেলেও যেমন ভিড় কারণ মেলের অর্ধেকটা মিলিটারির বড়বাবুদের জন্যে রিজার্ভ থাকতো, আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও তেমনি ঠাসাঠাসি — তিলধারণের জায়গা থাকতো না। সে একটা সময় গেছে বটে! ঐ রকম দুর্যোগের মধ্যেও অত ভিড় ঠেলেও পাড়ি জমাতে হতো। কথায় বলে না, চাকরী জিনিসটা খুব সুখের নয়, মর্মে মর্মে তা অনুভব করতাম।

তবে আমাদের একটা সুবিধে ছিল, আমরা ট্রায়ালভ্যানে করে যাতায়াত করতে পারতাম। অবশ্য এটা বেআইনী ব্যাপার। কিন্তু ভিড়ের বেলায় আইনের প্রতি আনুগত্য অতখানি ছিল না। কারখানা থেকে রেলের বগি তৈরী হলেই যে তাতে লোক চড়ে বসতে পারবে এমন কোন কথা নেই। সেই বগিকে একটা একটা করে বড় বড় মেল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পেছনে জুড়ে দেয় — এক নাগাড়ে তারা কেমন চলে তা দেখার জন্য। চাকা থেকে আগুন লাগে কিনা তাও দেখতে হয়। ঐ কামরার দরজা থাকে তালা বন্ধ, জানলাগুলোও ভেতর থেকে আটকানো, ইলেকট্রিক বা অন্য কোন রকম সংযোগ থাকে না মূল গাড়ীটার সঙ্গে। শুধু গার্ডের কামরার শেষে একটা বা দুটো বগি জুড়ে দেয় চার পাঁচশো কিলোমিটার চলার জন্য। এইরকম বগিকে ট্রায়ালভ্যান বলে। বার দশেক এই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই তা যাত্রীদের বহন করার উপযুক্ত বলে গণ্য হতো।

আমরা রেলের কর্মীরা ভিড়ের ট্রেনে না উঠে ট্রায়াল বগিতে ওঠার চেষ্টা করতাম। আগে থেকে স্টেশন মাষ্টারের কাছে থেকে খোঁজ নিয়ে জেনে নিতাম ঐ ট্রেনে কোন ট্রায়াল বগি জুড়ে দেওয়া হবে কিনা।

যে রাতের কথা বলছি, সেটা একে শীতের রাত — তার ওপর যুদ্ধের সময়কার জরুরী অবস্থা। ফলে, বোম্বে মেলে যে উঠতে পারবো চক্রধরপুর থেকে এমন নিশ্চয়তা নেই। গার্ডের গাড়িতেই হয়তো যেতে হবে। মোটা র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে ছোট একটা হোল্ডল নিয়ে স্টেশনে এসে শুনি — বোম্বে মেল দু ঘন্টা লেট; অর্থাৎ রাত্রি দুটোর আগে আর আসছে না। শীতে হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত জমে যাচ্ছে। প্লাটফর্মে বসে থাকা বা স্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে আড্ডা মারা চলে না।

পাহাড়ে জায়গা চক্রধরপুর, ছোট্ট পাহাড়ে ঘেরা, তাই সাংঘাতিক ঠান্ডা। শীতের রাত যে কি রকম যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে তার ধারণা আমার এই প্রথম।

স্টেশনে এসে শুনলাম এই বোম্বে মেলের সঙ্গে একটা ট্রায়াল বগি জুড়ে দেওয়া হবে। নতুন বগি, সবে লাইনে বেরিয়েছে, দুদিন হলো খড়গপুরের রেল কারখানা থেকে ছাড়া পেয়ে চক্রধরপুর সাইডিংয়ে রয়েছে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা কুলিকে ডেকে নিয়ে সাইডিংয়ে গিয়ে ট্রায়াল বগিতে উঠলাম কষ্ট করে, স্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে রেল-কামরার দরজার চাবি আনিয়ে দরজা খোলা হলো। ছোট্ট একটা সিঁড়ির ব্যবস্থা করে বগিতে উঠে লম্বা একটা বেঞ্চে হোল্ডল খুলে বিছানা করে দিলাম। দরজা লক করে চাবিটা ফেরত দিলাম কুলির হাতে। শীতের মধ্যে চারিদিক বন্ধ সেই বগিতে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম, বোম্বে মেল এলে তার পেছনে সাট্‌ল ইঞ্জিন এই বগিটাকে টেনে নিয়ে জুড়ে দেবে — এই রকমই হয়।

বগিটা ছিল থার্ড ক্লাসেব সাধারণ কামরা, লম্বা ধরণের, দু'পাশে বেঞ্চ আর মাঝখানেও আর একসারি বেঞ্চ। গাড়ীটায় এখনো তেল রঙের গন্ধ ঘোচেনি। আলো নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীত আর অন্ধকার যেন একত্রে জমাট বেঁধেছে সেখানে। নিরালোক কয়লাখনিও এমন অন্ধকার নয়। এলার্ম চেনও নেই, আলোও নেই, দরজা-জানালা খোলা নেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না — যখন ঘুম ভাঙলো, বুঝলাম বগিটা চলতে শুরু করেছে। খটাং খটাং আওয়াজ হচ্ছে, বোম্বে মেলের পেছনে বগিটাকে জোড়া হলো, সাট্‌ল ইঞ্জিনটা খুলে চলেও গেল। নিশ্চিত হলাম সকালে বিলাসপুরে গিয়ে নামাও যাবে, অফিসের কাজ সারতে আর দেরী হবে না।

চক্রধরপুর থেকে গাড়ীটা ছাড়তে না ছাড়তেই দেখি আমার সামনে বেঞ্চে আর একজন কে বসে ; আমার পা দুটো যেদিকে — সেদিকেই সে বসে রয়েছে। কিন্তু লোকটা উঠলো কখন?

আপাদমস্তক লম্বা গরম কোটে মোড়া, মাথায় টুপি, হাতে-পায়ে মোজা পরা হবে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, অন্ধকারেও তার বিশাল বপুটা মালুম হচ্ছে। আমি ভদ্রতার খাতিরে ঘুরে শুলাম, অর্থাৎ যেদিকে আমার পা দুটো ছিল, এবার সেদিকেই মাথা রাখলাম। আমার মতো এই লোকটাও যে রেলকর্মী, সে-বিষয়ে সন্দেহ হলো না, লাইনে কোন কাজে যাচ্ছে। রেলকর্মী ছাড়া এখানে আর উঠবে

কে! যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম, তখন উঠে থাকবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ফের একটা ঘুম দেবার চেষ্টা করলাম। গাড়ী তখন চক্রধরপুর স্টেশন ছেড়ে বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে। ঘন্টা দুয়েকের আগে আর কোথাও থামবে না।

লোকটা হঠাৎ ধরা গলায় আমাকে ইংরেজীতে যে প্রশ্ন করলো তার বাংলা মানে হচ্ছে — আচ্ছা আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

ভূত?

হ্যাঁ ভূত! ভূত বিশ্বাস করেন?

হতচকিত হয়ে আমি জবাব দিই — না, করি না।

কিন্তু আমি করি। — এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা উঠে গেল কামরা থেকে, কিছুতেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ট্রেন ছুটছে, দু'ঘন্টার আগে আর কোথাও দাঁড়াবে না, ট্রায়াল বগিতে আলো নেই, এলার্ম চেন নেই।

ছক্কা মিয়ার টমটম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কামিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড় বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশ মাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড় বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে এক চিলতে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসবে মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং ...টং লং ...টং লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি তেরপলের চৌকা একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু।

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল চালিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম — টং লং ...টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজী 'ট্যান্ডেম' থেকে — যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যোতা। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কা মিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারী বদরাগী। ঢ্যাঙ্গা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রঙ রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড় জিরজিরে লম্বাটে

গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিংঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়ি কুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড় মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না। কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি। ...

সেবার পুজোর সময় কলকাতার থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপস্!'

ওই টমটমে কখনও চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে তাই না ছোটমামা?'

ছোটমামা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে! বুঝবে ঠ্যালাটা 'খন।'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুন্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড় বৃষ্টি হবে। কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড় বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছন দিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এক্ষুণি একগাদা লোক এসে ভাল জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার উপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা

ফাঁক করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনা দুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা। এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চি হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপস্' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপস্'। হাড়গোড় মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই আর মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কা মিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজী হয়ে উঠছে। একটু পরেই দড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টপ্পরের তেরপলে পড়তে শুরু করলে ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাঁট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড় বৃষ্টিটা ছক্কা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারে গভীর খালে নাকানি চুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ — টং লং ... টং লং ... টং লং ... । কখনও ছক্কা মিয়ার টাট্টু ঘোড়া বিকট চি হিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষিরাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। এক সময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'আঃ হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন?'

'কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠান্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠান্ডা। হাড় অব্দি জমে গেল দেখছেন না।'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক্‌খিক্ খিক্‌খিক্।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনো শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মত হিম। বললুম, 'ইস। একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠান্ডা করে যে।'

লোকটা ভারি অদ্ভুত। সে ওই বিদঘুটে খিক্ খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটমামা। ছোটমামা।'

কিন্তু ছোটমামার কোন সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটমামা। কোথায় তুমি?'

লোকটা সেই খিক্ খিক্ হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলাম। স্যুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যিই ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকছে। আমি প্রচন্ড চেঁচিয়ে বললাম, 'ছক্কা মিয়া। ছক্কা মিয়া। গাড়ি থামাও। গাড়ি থামাও!'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামাটা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও বলছি!'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই?'

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট। পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো!'

'সামনে একটা মন্দির আছে। সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে সেখানে থামলে ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন

বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলুম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লুম। বুদ্ধি করে ছোটমামার স্যুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দুহাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চি হিঁ হিঁ ডাক ডাকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া।

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি।

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে কে?'

ছোটমামার সাড়া এল। অন্তু নাকি রে?

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা? ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার? যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কখনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে স্যুটকেসটা দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও? ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বেই পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা টান মেরেছে যে আমি ওর সঙ্গে

তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর ? তারপর ছোটমামা ?'

'তারপর আর কী ? ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব্ব এ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুঁড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোন বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে। ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে ট্যাস। বাপস্‌।'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনের সওয়ারিও কি লোক নয় ? সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল ? অন্য লোকটার মতো ?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপস্‌!' ...

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, এক রাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলাম, লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশন বাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে এক টুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চাওলা সবে ঝাঁপ ফেলার যোগাড় করছিল, আমাকে দেখে তার বুঝি দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা ?'

'কিসে আর যাব ? বরং দেখি যদি ওয়েটিং রুমে কাটানো যায়।'

চাওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলেও গিয়েছিলাম। সেবার ঝড় বৃষ্টি ছিল, কম। ছোটমামাও বড় গল্পে মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরী। ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে এক টুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া ?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটমে চড়তে বলল।

আজ আ কোন সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি

নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চি হিঁ হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমন কী ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায় নি। আর সে অদ্ভুত ঘন্টার শব্দ, টংলং ... টংলং... টংলং।

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁসে রইলুম। সামনের মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নায় ঝিম ধরা মাঠ ঘাঠ চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে, আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো।' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু'ঠ্যাং তুলে একখানা চি-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলাম। 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টপ্পরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নাম ধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেন নি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

'বংকুবিহারী রায়।'

'আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?' ওঁকে খুশি করার জন্যই বললাম।

বংকু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম। ব্যাটা এক দাগী বেগুন চোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দু'জন সেপাই নিয়ে ওত পেতেছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না।

তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে

আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুন চোর এই শীতকালে সারা রাত তালগাছের ডগায় বসে আছে। কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা।'

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বংকু দারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এত রাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে।'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে ...' কথা কেড়ে বংকু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুটকো রোগা চিমসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কিনা।'

এবার আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই।'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত।'

বংকু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপস! এ যে বেজায় ঠান্ডা!'

'ঠান্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

' না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সেঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠান্ডা ছিল না।'

'কী? আমায় সিঁদেল চোর বললেন?'

বংকু দারোগা গলার ভেতরে বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, পুলিশ হোন, আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।'

দারোগাবাবু ফের মুখের উপর টর্চ জ্বেলে বললেন, 'উহুঁ হুঁ! বড্ড এগিয়ে

এসেছেন। সরে বসুন। সরে বসুন বলছি।'

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়! 'টর্চ নেভান ' বলে টর্চটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধহয় ভুল হল। বংকু দারোগা বিকট গলায় 'ভূত! ভূত!' বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টপ্পরের এক পাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচন্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশা ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে সরে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টংলং ... টংলং ...টংলং ...

ভাগ্যিস রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল. লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, 'বাবু, ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে। ভাগ্যিস টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কান্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালয় ভালয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।'

বংকু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে, সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কী ঘটল পরদিন শুনলাম। বংকুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামী ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমড়ের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চাওলা। কেমন হেসে বলেছিল ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন। সব জেনে শুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা।

অবশ্য এমন হতে পারে, সে বলেছিল 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।' আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলাম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ! ...

ভূতেরা বিজ্ঞান চায় না

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদার চিরকালই উটের মত হাঁটে। কিন্তু সেদিন দু দুটো চাণক্য চাকলাদারকে পিঠ কুঁজিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ কপালে তুলে ফেললাম।

একেবারে একই রকমের চাণক্য চাকলাদার — এক জোড়া। যেন সন্দেশের ছাঁচ থেকে তৈরী। আমি চোখ গোল গোল করে দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি দেখে দুজনেই হাসলো। এবং তখনি লক্ষ্য করলাম পার্থক্যটা।

একজন হাসল কাষ্ঠহাসি, আড়ষ্ট বদনে। আর একজন হাসল উল্লাসের হাসি, উৎফুল্ল আননে।

দ্বিতীয় জনই তাহলে আসল চাণক্য। চাণক্য চিরকাল হাসে এবং হাসায়। একটু গুলপট্টি মারে ঠিকই, তা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

অতএব কেশে গলা সাফ করে নিয়ে (আসলে ঘাবড়ে যাওয়াটা কাটিয়ে নিয়ে) বললাম তেড়েমেড়ে আসল চাণক্যকে — ছদ্মবেশী দু নম্বরকে এনেছো কেন? মতলবটা কী?

উৎফুল্ল চাণক্য আমার টেবিলের কোণে বসে পড়ে লম্বা ঠ্যাং দুটোকে দোলাতে দোলাতে ম্রিয়মান চাণক্যকে ধমকে বললে — দাদা রেগেছেন দেখতেই পাচ্ছো। তখনই বললাম পেছন পেছন এসো না। যাও, ওই চেয়ারটায় বসো। কাছে এসো না।

সুড়সুড় করে নকল চাণক্য গিয়ে বসল আমার ভাঙা চেয়ারটায়। চেয়ারের বেত ছিঁড়ে গেছে। গর্তের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়ে আটকে গেল। এবং সেইভাবেই হাঁটু দুটো প্রায় চিবুকে ঠেকিয়ে বসে রইল। জুলজুলে চাহনি কিন্তু

আটকে রইল নাম্বার ওয়ান চাণক্যর দিকে।

আমি এবার বললাম "বৎস চাণক্য, কহ অকস্মাৎ কেন এহেন রঙ্গ?"

আসলি চাণক্য বলল "দাদা, ক্লোনিং সম্ভব হয়েছে শুনেছেন নিশ্চয়?"

"ক্লোনিং!"

"আকাশ থেকে পড়লেন মনে হচ্ছে।"

" না, না, আকাশ থেকে পড়ব কেন? ডেভিড রোরভিক-এর 'ইন হিজ ইমেজ' বইটা আমারও পড়া আছে, এই তো সেদিন, মানে ১৯৫২ সালে রবার্ট ব্রিগস আর টমাস কিঙ আফ্রিকান চিতা-ব্যাঙ-এর নকল তৈরি করেছেন গবেষণাগারে। প্রকৃতিকে টেক্কা মেরেছেন।"

"শুরুটা হয়েছিল প্রফেসার এফ সি স্টুয়ার্ডের কর্নেল ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে — ১৯৬০ সালে। মনে পড়ে? হাসল চাণক্য। হাসিটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। কিরকম যেন গা ছমছম করতে লাগল।

চাণক্য যেন আমার মনের ভয় আঁচ করে নিয়ে হাসির ধরণ পাল্টে নিল চট করে। মোলায়েম হেসে বলল — "গাজরের গা থেকে কোষ চেঁচে নিয়ে নারকেলের দুধ মেশানো পোষ্টাই সলিউশনে ডুবিয়ে রেখেছিলেন প্রফেসর। আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে ছেড়েছিলেন। কোষ থেকে সত্যিকারের গাজর তৈরি হয়েছিল।"

"এরই নাম ক্লোনিং", বলেছিলাম আমি।

ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চোখ দুটো শক্ত করে চাণক্য (মানে আসল চাণক্য) বলল— ১৯৬৮ সালে ক্যালটেক বায়োলজিস্ট ডক্টর রবার্ট এল সিনশিমার বলেছিলেন, আর বছর দশেকের মধ্যেই মানুষ ক্লোন সম্ভব হবে। মানে এ মানুষের কোষ চেঁচে নিয়ে হুবহু ঐরকম গাদা গাদা মানুষ কারখানায় তেরি করা যাবে।"

নড়েচড়ে বসলাম — "কিন্তু হুঁশিয়ার করেছিলেন জেমস ওয়াটসন, ডি এন এ গবেষণায় নোবেল পুরস্কার জিতেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি। মানুষ ক্লোন করতে বারণ করেছিলেন।"

চোখ পাকিয়েই বলল চাণক্য — "চোখের রঙ, নাকের গড়ন, ব্রেন, মন—সবই এক হবে, কিন্তু আত্মা তো এক হবে না। ফ্রাঙ্কেস্টাইনের গড়া দানব সৃষ্টি হতে পারে — এই ভয় করেছিলেন।"

ঠিক কথা। কিন্তু জে বি এস হ্যালডেনের মত বৈজ্ঞানিক মনে করতেন মানুষ ক্লোন অনেক অসাধারণ গুণের অধিকারী হবে। রাত্রে দেখতে পাবে, যন্ত্রণাবোধ

থাকবে না, আলট্রাসনিক সমরাস্ত্রর আওয়াজ শুনতে পাবে না, বেঁটে বামন করে গড়ে তুলতে পারলে মানুষ ক্লোন বড় বড় গ্রহের মাধ্যাকর্ষণকে কলা দেখিয়ে কলোনি গড়ে তুলতে পারবে —

এবার দাবড়ানি দিয়ে বলল চাণক্য (কখনো আমাকে অন্তত দেয় না) — "থামুন থামুন, প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে এমন তথ্য থাকে যা দিয়ে গোটা শরীরটাকে ফের গড়া যায় — লাখে লাখে গড়া যায় তাও মানছি — কোষের জেনেটিক অ্যাপারেটাসের সুইচটা বন্ধ রেখেছেন প্রকৃতি যাতে এই অঘটন না ঘটে—মানুষ ঘটাতে চায় সেই বিপর্যয়। গোপনে মানুষ ক্লোন তৈরি করে ফেলেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

চাণক্যর কটমটে চাহনি আর সহ্য হল না। খেপে গিয়ে বললাম — "তাতে অত চেল্লাচেল্লি করার কি আছে? আইনস্টাইনের রেখে দেওয়া ব্রেনের একটা কোষের বায়োকেমিক্যাল সাপ্রেসর হটিয়ে দিয়ে লাখ লাখ আইনস্টাইন তৈরি করা যাবে —"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চাণক্য বললে "মিশরীয় ম্যমী রাজা তুতানখামেনের দেহে যেটুকু ডি এন এ এখনও আছে, তা থেকে লাখ লাখ তুতানখামেনও তৈরি করা যাবে।"

"অ্যাঁ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যদি মানুষ ক্লোন করতে আরম্ভ করেন, আমরাও তাহলে কবরের মড়া তুলে লাখে লাখে জ্যান্ত মড়া বানিয়ে চলব।"

"তো-তো-তোমরা মানে?" আড়চোখে তাকালাম দুনম্বর চাণক্যর দিকে। সে দেখলাম একেবারে নীল হয়ে গেছে। মুখে রক্ত টক্ত কিচ্ছু নেই।

অট্ট হেসে এবার বললে আসল চাণক্য (সেকি অট্টহাসি ... হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল আমার) "দাদা, বিজ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করুন। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও যা জানে না, আমরা তা জানি। আমাদের ভাত মারতে এলে সর্বনাশ করে ছাড়ব।'জবাব দিলাম একটা বটে, কিন্তু চিঁ চিঁ গলায় — "কি-কি জানো তোমরা?"

"হাইপার গ্র্যাভিটি নিয়ে খুব তো লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছে আপনাদের বৈজ্ঞানিকরা। পৃথিবীর মাটি থেকে ছশো ফুট উঁচু পর্যন্ত সব কিছুকেই মাধ্যাকর্ষণের উল্টো একটা শক্তি ওপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিব্বতের সাধুরা অনেক আগেই জানত এই হাইপার-গ্র্যাভিটির খবর। যোগাসনে বসে শূন্যে উঠে

পড়ত। জানি আমরাও। দেখবেন?"

বলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চাণক্য টেবিলে টেড়ে বসা অবস্থাতেই ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেল কড়িকাঠের কাছে। আবার নেমে এল টেবিলের ওপর।

বললে — "দেখলেন? এরই নাম লেভিটেশন। আপনাদের উজবুক বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া নাম। এসব শক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় বলেই আমরা—

গোঁ গোঁ শব্দ শুনে চেয়ে দেখি চেয়ারে গেঁথে থাকা চাণক্য অজ্ঞান হয়ে গেছে।

দেখে কেমন জানি মায়া হল টেবিলে বসে থাকা চাণক্যর — "বেচারা। ঐ তো মুরোদ। ক্লোনিং নিয়ে খুব কপচাচ্ছিল গাছতলায় বসে। গাছটা যে নিমগাছ খেয়াল নেই। আমি ভূতলৌকিক কমিটির প্রেসিডেন্ট, মগডালে বসে অলৌকিক আর অপবিজ্ঞানের গবেষণা করছি জানেও না। প্রফেসার ঝি ঝি ঝাঁকতালের সঙ্গে চ্যাংড়ামি। দিলাম একটা ডোজ দিয়ে। হুবহু একখানা চাণক্য চাকলাদার হয়ে লাফিয়ে নামলাম সামনে।"

"তারপর?" গালে হাত দিয়ে বললাম আমি।

"তখনি অক্কা পেলে ল্যাটা চুকে যেত, দল ভারি করা যেত। বজ্জাত মানুষ বৈজ্ঞানিকগুলো এমন সব দাওয়াই বার করেছে, মানুষ মরছেও না — ভূতদের পপুলেশন বাড়ছে না। তা আপনার এই আখাম্বা লম্বা সাগরেদটা 'দাদারে বাঁচান বাঁচান' বলে অসভ্যের মত এমন চ্যাঁচাতে লাগল যে আপনাকেও একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করলাম। চলে এলাম ঠিকানা নিয়ে। কিরকম বুঝছেন?"

"খু-উ-ব ভাল", বললাম কষ্টেসৃষ্টে। "ভূতেদের আজকাল দর্শন পাওয়াও ভার। এত ভীতু — মানুষের ভয়ে দেশছাড়া, আবার আম্বাকত লাখে লাখে মড়া জাগাবে ছোঃ!"

তড়াক করে লাফিয়ে মেঝে থেকে কড়িকাঠের কাছে পৌঁছে গেল চাণক্যরূপী প্রফেসর ঝি ঝি ঝাঁকতাল। কড়িকাঠে মাথা লাগিয়েই লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল বন্ বন্ করে।

দেখলাম সেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ঝাঁকতালের ঘূর্ণ্যমান দেহ থেকে রাশি রাশি চাণক্য চাকলাদার ছিটকে যাচ্ছে ঘরময় এবং ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে মেঝের ওপর। দেখতে দেখতে ঘর গিজগিজ করতে লাগল অজস্র চাণক্য চাকলাদারে। একই রকম দেখতে। এক রকম চাহনি। একই রকম হাঁটা।

এইটুকু ঘরে এতজনের জায়গা হবে কি করে যখন ভাবছি, প্রফেসর ঝি ঝি ঝাঁকতাল চোঁ করে নেমে এল আমার টেবিলের ওপর। বডি ঘোরা থেমে গেছে। শুধু চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে চর্কিবাজির মত ঘুরছে। (রাগে নিশ্চয়) আর কোটর থেকে ফুলকি ঠিকরোচ্ছে!

পাছে আবার অপবিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে বসে, তাই তাড়াতাড়ি বললামঃ "মাই ডিয়ার প্রফেসর, মাঝে মাঝে আসবেন। পি সি সরকারের ম্যাজিক টিমে আপনাকে ঢুকিয়ে দেব। এখন বিদেয় হোন চ্যালাচামুণ্ডাদের গায়ে ঢুকিয়ে নিন। চামসে গন্ধ ছাড়ছে।"

"আর হবে না তো?" ভৌতিক খোনা স্বরে বললে ঝাঁকতাল।

"কি হবে না?"

"মানুষদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা?"

"বলে দেখব। যা ঠ্যাটা ওরা।"

"ভূত সাম্রাজ্য গড়ে তুলব গোটা পৃথিবীতে — খেয়াল থাকে যেন।"

"থাকবে প্রফেসর, থাকবে। এখন নিমগাছে ফিরে যান — গবেষণা অসমাপ্ত রেখে এসেছেন—

"তাই তো।" আঁতকে উঠল প্রফেসর ঝি ঝি ঝাঁকতাল — পচা মাছের টনিকটা গেল বোধহয় বারোটা বেজে। গন্ধ শুঁকলেই শরীর যাদের নেই, তারা শরীরী পাবে এখন থেকে। একটোপ্লাজমের দরকারই হবে না। গুডনাইট, দাদা।"

"গুডনাইট ঝাঁকতাল।"

একটা ঝড় বেরিয়ে গেল ঘরের ভিতর থেকে বাইরে। কালো ঝড়।

চেয়ারের গর্ত থেকে উঠে বসল আসল চাণক্য চাকলাদার — যাকে এতক্ষণ নকল মনে করেছিলাম।

বললে — "অজ্ঞান হইনি। মটকা মেরে পড়েছিলাম।"

"চ্যাংড়ামি করতে গেলে কেন?" এতক্ষণে ফাটলাম বোমার মত।

"না করলে এমন একখানা গল্প পেতেন কোথায়?"

বলে একটা লম্বা চুরুট ধরাল চাণক্য।

হুড়কো ভূত

অমিতাভ চৌধুরী

আমার মেজ পিসিমার বাড়িতে একবার ভূতের উপদ্রব হয়েছিল। ঠিক ভূত নয়, শিবের চ্যালা নন্দী-ভৃঙ্গীর উৎপাত। এই উৎপাতে সারা গাঁ যেমন ভীত, তেমনি বিস্মিত।

ছেলেবেলার কথা বলছি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন আছি মামাবাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। ওখানকার ইস্কুলে পড়ি। আমার মামাবাড়ির ঠিক পিছনটাতে ফার্লংখানেক দূরে মেজ পিসিমার বাড়ি। পিসিমা সাদা-সিধে ভালো মানুষ। দেব-দেবী ভূত-প্রেত সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। পিসেমশাই আরও ভালো মানুষ। গ্রামের পাঠশালার গরীব মাষ্টার। মাস মাইনে বারো টাকা। ছোট্ট বাড়ি অল্প জমি সামান্য চাকরি নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে।

তাঁদের একমাত্র ছেলে বেণুলাল — আমার রাঙাদা।

রাঙাদা বয়সে আমার চাইতে আড়াই বছরের বড়। পড়াশোনার নাম নেই, টো টো করে ঘুরে বেড়ান, গুলতি দিয়ে পাখি মারেন, অদ্ভুত সব গল্প বলেন এবং চক-খড়ি দিয়ে বাড়ির যত্রতত্র ছবি আঁকেন।

ছোট্ট একতলা বাড়ি। টিনের চাল, একটি ঘরকেই দরমার বেড়া দিয়ে তিন ঘর। সামনে দুটি ঘরের একটিতে রাঙাদা, অন্যটিতে পিসিমা-পিসেমশাই এবং পেছনের তিনদিক খোলা টানা লম্বা ঘরে রান্নাবান্না। রান্নাঘর দরমার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাড়ির পেছনে গাছপালা আগাছার জঙ্গল। ছোট্ট একটা মজা পুকুরও সেই জঙ্গলের গায়ে।

টানাটানির সংসার, কিন্তু এক ছেলে বলে রাঙাদার আদরের শেষ নেই। তার আবদারেরও শেষ নেই। 'অমুকটা চাই' বলামাত্র এনে দিতে হবে। বেচারা

পিসেমশাই। যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে আদুরে ছেলের আবদার মেটাতে গিয়ে তিনি জেরবার।

মেজ পিসিমার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী। গায়ে লাল কাপড়, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল। সাক্ষাৎ শিব। পিসিমা তো তাই ভেবে বসলেন। সাধুবাবা বললেন, এইমাত্র কৈলাস থেকে তিনি আসছেন। একটু আশ্রয় দরকার। এই গ্রামে পাপ ঢুকেছে। পাপ তাড়াতে কিছুদিন থাকতে হবে।

পিসিমা তো বিশ্বাস করার জন্যে বরাবরই প্রস্তুত। লম্বা প্রণাম ঠুকে সাধুবাবাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁকে শাক ভাত ডাল খাইয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সাধুবাবা ওই বাড়িতে থেকে গেলেন। খান-দান, মাঝে মাঝে 'দেহি ভবতি ভিক্ষাং' বলে গাঁয়ে ঘোরেন এবং কেউ কটু কথা বললে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেন। গাঁয়ের অবিশ্বাসীরা সন্দেহের চোখে তাকায়, ভাবে কোন ফেরারী আসামী নয় তো? সাধু সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছে? আর বিশ্বাসীরা তো শিব জ্ঞানে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে লাগলো।

সাধুবাবার কাছে আমিও যাই। তিনি আমাদের প্রায়ই কৈলাসের কথা শোনান। তোফা জায়গা। ওয়েদার ভাল, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। নেহাৎ এক কঠিন প্রয়োজনে তাঁকে কৈলাস ছেড়ে আসতে হল। পিসিমার ভাইপো বলে আমাকে অধিক স্নেহ করেন, বলেন, কিছু ভাবিস না, তোর হবে। আমার কী যে হবে আমি নিজেই জানি না। তবে সাধুবাবাকে পুরো অবিশ্বাসও করি না। বলা যায় না, হয়ত শিবই। নইলে সেদিন রূপসী গাছের তলা থেকে সাপ ধরে আনলেন কী করে?

সাধুবাবা মেজ পিসিমার বাড়িতে থেকে গেলেন। তাঁর আনা ভিক্ষের চাল সংসারে লাগে। তিনি নানা রকম গল্প শোনান এবং মাঝে মাঝে 'বোম বোম' বলে কৈলাসের স্মৃতি রোমন্থন করেন। সাধুবাবা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, একদিন তিনি আমাকে কৈলাস দেখিয়ে আনবেন।

আমার সোনা মামা থাকতেন বাইরে। সেবার পূজোর সময় বাড়িতে এসে সাধুবাবার খবর পেলেন। তিনি দেখেই বললেন, ভন্ড প্রতারক। সাধুবাবাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো ভয়ে মরি, যদি শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন সোনা মামাকে।

সাধুবাবা কিছু মনে করলেন না, স্মিত হেসে চলে যান। সোনামামাও ভস্ম হন

না। বিশ্বাস অবিশ্বাস মিলিয়ে সাধুবাবা গ্রামে থেকে গেলেন। আর আমার মেজ পিসিমা ও পিসেমশাই শিব ঠাকুরের দয়ায় অচিরে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন। আগের জন্মে কী কী অপরাধের জন্য তাঁদের আর্থিক দুর্দশা, একথা সাধুবাবা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আশ্বাস দেন, এত বছর এত দন্ড এত পল পেরিয়ে গেলে সব দুঃখ মোচন হয়ে যাবে।

ইস্কুল ফেরৎ আমি মাঝে মাঝে সাধুবাবার কাছে যাই। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, আমি যেন শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। সাধুবাবা কথা বলতে বলতে কী যেন বিড়বিড় করেন। পিসিমা বলেন, মা দুর্গার সঙ্গে কথা বলছেন। হতেও পারে। প্রলাপেই সংলাপ।

রাঙাদার দুষ্টুমিতে গ্রামের লোকজনেরা তিতিবিরক্ত হলেও সাধুবাবা ক্ষমাশীল। বলেন, ওটা হনুমান ছিল ত্রেতাযুগে। বাঁদরামি করলেও ভক্ত মানুষ। একথায় আমারও বিশ্বাস হয়েছিল। কেননা, দেখতাম রাঙাদা হনুমানের ছবি খুব ভালো আঁকতে পারেন।

রাঙাদা আমায় খুব ভালোবাসেন। অনেক সময় আমাকে তাঁর দুঃসাহসী অভিযানের সঙ্গী করতে চান; অন্যের নৌকা নিয়ে নদী পাড়ি কিংবা আম গাছের ডগায় উঠে পাখির ছানা ধরে আনা কিংবা পানাপুকুর সাঁতরে এপার ওপার হওয়া তার কাছে নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি ভীতু মানুষ, কোনটাতেই রাজি হই না। আর যদিও বা সাহস করে সঙ্গী হতে চাই, জানি তাহলে দিদিমা ও সোনামামা বকবেন। ওদের ধারণা বেণুলাল বকাটে ছেলে।

রাঙাদার উপর মাঝে মাঝে ভড় হত। ঘুমের মধ্যে কী সব বিড়বিড় করতেন। সাধুবাবা মন্ত্র পড়ে ঠান্ডা করতেন। একবার রাঙাদা মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে সামনের বড় পুকুরে ঝাঁপ দেন। পেছন পেছন ছোটেন পিসেমশাই ও সাধুবাবা। পিসেমশাই জলে নেমে তাকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারবেন কেন। বাকি রাত জলের মধ্যে দাপাদাপি চলল। বেচারা পিসেমশাই। রাঙাদা যখন পাড়ে উঠলেন, তখন চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন ঘাটে। যেন ঘুমের মধ্যেই সব কিছু হয়েছে। অনেক দিন পরে রাঙাদা আমার কানে কানে বলেন, মজা করার জন্যে রাতভোর সাঁতার কেটেছিলেন।

সেই রাঙাদার বাড়িতে হঠাৎ শোনা গেল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। রোজ রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, ঠিক তখন শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝের দরমার দরজা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা হয়। এ পাশের লম্বা বাঁশের হুড়কো

নড়তে থাকে এবং হাতে হুড়কো চেপে না ধরলে ভূত হুড়মুড় করে শোবার ঘরে ঢুকে যেতে পারে। ওই লম্বা বাঁশের হুড়কো এমনিতেই নড়বড়ে। চোর আটকাবার জন্যে নয়, শেয়াল কুকুর যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্যেই।

সারা গ্রামে আতঙ্ক। এমনিতে ভূত-প্রেতরা সব গ্রামের রাস্তাতেই ঘুরে বেড়ায়। বেম্মদত্যি বেলগাছের ডালে বসে থাকে, শাঁকচুন্নি বোয়াল মাছ ভাজা খাবার জন্য লম্বা হাত বাড়ায়, পেত্নী বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভয় দেখায়। অন্ধকার, ঝোপঝাড়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, হুতোম প্যাঁচার ডানা ঝটপটানি — সব মিলিয়ে সব রাত্রেই এক ভৌতিক পরিবেশ। তার মধ্যে দু-চারজন ভূতের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী পিসিমার বাড়িতে প্রবেশ বিচিত্র নয়।

গ্রামের লোকেদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে গেল ওই ভূতের উপদ্রব। হাটে মাঠে বাজারে পুকুর ঘাটে রেল স্টেশনে আরও রঙ চড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওই ভূতের কাহিনী বলা হতে লাগল। মেজ পিসিমা কিঞ্চিৎ ভীতু, তবে তার ভরসা সাধুবাবা। শ্মশানচারী শিব যখন বাড়িতে, তখন দু-চারটে ভূতের উপদ্রব তো হবেই। ভূতের হাত থেকে বাঁচাবেনও সাধুবাবা। সুতরাং ভয় কিসের। বেচারা ভালোমানুষ পিসেমশাই, তার হয়েছে মুশকিল। রোজ মাঝরাত্তিরে ওই হুড়কো ধরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একদিকে ভূত, অন্যদিকে পিসেমশাই। সাধুবাবা অবশ্য বলেন, নন্দী ভৃঙ্গী বড় জ্বালাচ্ছে। কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্য রাত্তিরে এসে হামলা করছে। আরে বাবা, বললেই তো আর যাওয়া যায় না। কাজ ফুরোক তবে তো — বোম্ বোম্।

সরল বিশ্বাসী পিসিমা এসব কথা শুনে আরও নির্ভয় হয়ে গেলেন। স্বামী পুত্র সাধুবাবা ও নন্দী ভৃঙ্গীর হামলা নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগলেন।

গ্রামের লোকদের কৌতুহল আরও বেড়ে গেল। রোজ রাত্রে পালা করে অনেকে ওই বাড়িতে আসতে লাগলেন স্বচক্ষে ভূতের হুড়কো টানার ঘটনাটা দেখার জন্যে। প্রথমে একটু একটু নড়ে। শব্দ পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরে ফেলতে হয়। তারপর চলে লড়াই। খুব জোরে ধরে না রাখতে পারলে কেলেংকারি। ভূত দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়বে। যেন ভূতেরা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বা দেয়াল ফুঁড়ে আসতে পারে না।

এসব ব্যাপারে নির্বিকার কেবল রাঙাদা। ভূত টুত নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। যখন পাশের ঘরে তুলকালাম কান্ড চলছে, তখন তিনি গভীর ঘুমে। পিসিমা বলেন, 'আমার বেণুলাল বড় ঘুম কাতুরে। ভূত দূরের কথা, বাড়িতে ডাকাত

পড়লেও তার ঘুম ভাঙে না।'

হবেও বা। রাঙাদা যে রকম অদ্ভুত লোক, কোন কিছু কেয়ার না করে ঘুমিয়ে থাকতেই পারে।

তবে আর একটা ব্যাপারে সবাই ভূতের আগমন সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল। যখন হুড়কো নড়ে না, তখন বাড়ির টিনের চালে দুম দাম ঢিল পড়ে। এও যে রাগী ভূতের বা শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নন্দী ভৃঙ্গীর কান্ড, তাতে কোন সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা শোন সামনের এক ফালি বারান্দায়। তিনি সব শুনে মুচকি মুচকি হাসেন এবং হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার পাড়েন — 'বোম বোম।' বাড়ির চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, পেছনের বাঁশ গাছের ক্যাচ ক্যাচ এবং তারই মাঝখানে বোম-বোম আওয়াজ — সব মিলিয়ে গা ছমছম ব্যাপার। এমন অবস্থায় ভূত প্রেত আসতেই পারে।

এক রাত্তিরে সাহস সঞ্চয় করে আমিও হাজির হলাম ভূতের আসরে। আমার তখন বয়সই বা কত, আট নয়, সব কিছু বিশ্বাস করার সময়। শুধু ভয়, যদি সত্যি সত্যি ভূত ঘরে ঢুকে পড়ে? পরক্ষণে ভরসা পাই সাধুবাবাকে দেখে। তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু বিহিত করবেন।

আমি প্রথমে বললাম, রাঙাদার বিছানায় থাকব। রাঙাদা বললেন, ' না না, তুই যা অন্য ঘরে। এখানে আমার অসুবিধা হবে।'

আমার একটু খটকা লাগল, রাঙাদা ভূতের ব্যাপারে এতো নিরুত্তাপ কেন? কিন্তু সবাই ভূতের নড়াচড়া গতিবিধি নিয়ে এতো ব্যস্ত যে রাঙাদাকে নিয়ে তত মাথা ঘামায় না।

আমি যেদিন গেলাম, সেদিন একটু বাড়াবাড়ি হল। আমার মতো আরও কয়েকজন গ্রামবাসী ছিলেন ঘরে। সেদিনও হুড়কো নড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ছুটে গেলেন। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি যে পিসেমশাই আচমকা মাটিতে পড়ে গেলেন। পিসিমা সাধুবাবাকে হাঁক পেড়ে ডাকলেন। সাধুবাবা তাঁর বিছানা ছাড়লেন না। গাঁয়েরই আর একজন ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরলেন। ভাগ্যিস ধরলেন, নইলে ভূত দেখে মুর্চ্ছা যেতাম।

এইভাবে চলছে। সাধুবাবা ভূত হুড়কো টানাটানি নিয়ে গ্রামের মানুষ মেতে রইলেন। মেজ পিসিমার বাড়িতে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া হল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে। শুধু রাঙাদা যেন গম্ভীর। দিনের বেলা ভূত নিয়ে নানা রকম কথা তিনিও বলেন, কিন্তু রাত্রে চুপচাপ। পিসেমশাই হুড়কো

ধরার জন্য তাকে ডেকেও ভূতের কাছাকাছি নিয়ে আসতেপারেন নি। মেজ পিসিমা অবাধ্য ছেলের ঘুম ভাঙাতে নারাজ। সব ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে পিসেমশাইকে।

ভূতের খবর রটে গেল গ্রামের বাইরেও। অবশ্যই পল্লবিত হয়ে। সেই খবর শুনে শিলচর থেকে একদিন আমার বড় কাকাবাবু এসে হাজির। আমার বড় কাকাবাবু মানে রাঙাদার মামাবাবু। তিনি পিসিমা পিসিমশাইয়ের কাছে সব কথা শুনে শুম মেরে রইলেন। প্রথমেই পিসিমাকে বললেন, 'বুঝলে দিদি, যত গন্ডগোলের মূল ওই সাধুবাবা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াও, নইলে উপদ্রব কমবে না।'

পিসিমা জিব কেটে বলেন, 'ওরে ভূপেন্দ্র, এমন কথা বলিস না। বাবা সাক্ষাৎ শিব।'

বড় কাকাবাবু ঃ 'শিব তো এখানে কেন? ওকে শ্মশানে পাঠিয়ে দাও।'

পিসিমা ঃ 'শ্মশানে যেতেই পারেন, কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য বল দিকিনি, তিনি আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করেছেন।'

বড় কাকাবাবু ঃ 'নিজের অন্ন জোটে না,আবার অন্যকে অন্নদান। হু। তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কোন দিনই হবে না।'

রাত্রে বড় কাকাবাবুর উপস্থিতিতে আবার ভূতের আবির্ভাব হলো। সেই হুড়কো নড়া, পিসেমশাইয়ের ছুটে গিয়ে ধস্তাধস্তি, নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাধুবাবার 'বোম বোম' চিৎকার। বড় কাকাবাবু সব ভালো করে দেখলেন। তিনি বরাবরই সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতকে মনে করেন বুজরুকি। তিনি হুড়কো খুলে নিজে যেতে চাইলেন রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু পিসিমার মিনতিতে নিরস্ত হলেন।

বড় কাকাবাবু দেখলেন সবাই ব্যতিব্যস্ত, কেবল তাঁর ভাগনে শ্রীমান বেণুলাল কোন কথাটি না বলে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। তিনি 'বেণু বেণু' ডাকলেন, কিন্তু পিসিমা বললেন, ওকে ডাকিস না, বড় ঘুমকাতুরে। আর ভূতের ভয় ভীষণ। কেন মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দেওয়া।

বড় কাকাবাবু কী যেন আন্দাজ করলেন, পরের রাত্তিরে তিনি বললেন, বেণুর সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব। রাঙাদা খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু বড়কাকাবাবুর তিন ধমকে রাজি হতে হল।

দু'জনে একসঙ্গে শুলেন, তবু যে কে সেই। আবার একইভাবে হুড়কোর হামলা। তবে সেই রাত্তিরে টিনের চালে ঢিল পড়ল না।

বড় কাকাবাবু একটু চিন্তিত হলেন। তাহলে। ব্যাপারটা কী? তাঁর সন্দেহ কি ঠিক নয়? সাধুবাবার ওপর কড়া নজর রাখলেন এবং রান্নাঘর, দরমার বেড়া, হুড়কো, রাঙাদার ঘর, তার ঘরের বেড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। পিসিমা এসব দেখে একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু ছোটভাইকে কড়া করে কিছু বলতেও পারলেন না।

ওদিকে বড় কাকাবাবু রাঙাদাকে বললেন, চল আমার সঙ্গে শিলচরে। কয়েকদিন থেকে আসবি।

রাঙাদা কিছুতেই রাজি না। বলেন, 'অনেক কাজ আছে মামাবাবু, পরে যাব'খন।'

বড় কাকাবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু রাত্রে রাঙাদার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতে গেলেন। আগের দিনের চেয়ে একটু তফাৎ করলেন। রাঙাদাকে অন্যপাশে দিয়ে নিজে শুলেন দরজার বেড়ার দিকটায়। তক্তপোষটা বেড়ার গা ঘেষেই। ওপাশে রান্নাঘর এবং তিন চার হাত দূরে অন্য শোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে রান্নাঘরের সেই দরজা।

বড় কাকাবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঠায় বসে রইলেন বিছানায়। কড়া নজর রাঙাদার দিকে। মাঝরাত্তির আসে। ও ঘরে পিসিমা পিসেমশাই ও গাঁয়ের দু'চার জন লোক বসে। কিন্তু আশ্চর্য, হুড়কো নড়ল না। আরও অপেক্ষা। তবু নড়াচড়া নেই। সবাই কেমন হতাশ হয়ে গেলেন। একটু বাদে গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলেন যে যার বাড়ি। পিসিমা পিসেমশাই বসে রইলেন হুড়কোর দিকে তাকিয়ে। যদি নড়ে।

নড়লো না। এবং রাতও পুইয়ে আকাশ ফর্সা হলো। বড় কাকাবাবু রাঙাদার কান ধরে টেনে এনে হাজির করলেন পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছে, তারপর দুই গালে বড় দুই চড়।

সবাই হতভম্ব। রাঙাদা ভেউভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। বড় কাকাবাবু তাঁকে তখনও ধমকে চলেছেন।

আরও অবাক কান্ড। পিসিমা পিসেমশাইকে রান্নাঘরে নিয়ে দেখালেন, হুড়কোর সঙ্গে বাঁধা একটা শক্ত কালো গুলি সুতো। সেই সুতো দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাঙাদার বিছানার পাশে এক খুঁটিতে বাঁধা।

বড় কাকাবাবু বললেন, 'এবার বুঝলে তো দিদি, ভূতটা কে? তোমার গুণধর পুত্র। আমি তো বলি, সারা বাড়ি তোলপাড় আর বেণু কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তোমরা যখন ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকো, তখন সে শুয়ে শুয়ে ওই কালো

সুতো ধরে টান মারে। মারলেই হুড়কো নড়ে। বুড়ো বাপ ওর গায়ের জোরের সঙ্গে পারবে কেন? তোমরা তো বিশ্বাস করার জন্য বসেই আছ, আর ওই পাজিটা শুয়ে শুয়ে তোমাদের নাকাল করেছে। আর তোমরা যখন হুড়কো টানাটানিতে ব্যস্ত তখন একবার অন্ধকারে বাইরে গিয়ে চালে ঢিল মেরে আবার এসে শুয়ে পড়ে এবং আবার ওর সুতোর কেরদানি দেখায়। দেখো, আজ রাত থেকে আর কিছু হবে না। ঐই দেখো সেই সুতো। যত বদ বুদ্ধি সব মাথায়। কোথায় গেল সেই হতভাগা।

হতভাগা ততক্ষণে বাড়িতে নেই। ছুটে বাইরে। বড় কাকাবাবু সকালের ট্রেনেই শিলচরে ফিরে গেলেন। রাঙাদা হেলতে দুলতে তারপর বাড়ি এলেন। মুখের ভাবখানা এমনই যেন কিছুই হয়নি।

তবে সত্যি সত্যিই সেদিন রাত থেকে মেজ পিসিমার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থেমে গেল। মেজ পিসিমা বললেন, ভূপেন্দ্র বললো বটে, সুতোটাও দেখাল, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, আমার বেণুলাল এইসব করেছে।

সাধুবাবা বললেন, অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কথায় বিশ্বেস রাখতে নেই। নন্দীভৃঙ্গীই এসেছিল। না, আর এখানে নয়, কালই কৈলাসে ফিরে যেতে হবে দেখছি।

কোন কথা বললেন না শুধু পিসেমশাই। বহুদিন পর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারলেন।

ভূতে পাওয়া হরিণ

সংকর্ষণ রায়

ভূতে পাওয়া হরিণ! হরিণকে কি কোথাও ভূতে পায়?

আর কোথাও না পাক, মণিপুরের বিশেষ একটি জায়গায় পায়। সেখানে বিশেষ এক ধরণের হরিণ দেখা যায়, তাকে বলে 'ভুরু-শিং হরিণ'। মণিপুরীরা মনে করে এই ভুরু শিং হরিণের ওপরে ভূত ভর করে। জ্যোৎস্না রাতে জ্যোৎস্নার আলো বেয়ে নেমে এসে এই হরিণের কাঁধে চেপে বসে সে।

এই জায়গাটি হচ্ছে মণিপুরের লোগটাক্ হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ। দ্বীপটি জলের ওপরে ভাসমান। ভাসমান দ্বীপের ব্যাপারটা পরে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন এই 'ভুরু শিং হরিণকে' চিনে নাও।

ভুরু শিং হরিণকে ইংরেজিতে বলে 'ব্রো এনট্লারেড ডীয়ার'। আকারে খুবই ছোট। তার ভুরুর ওপরে শিং আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদাই সে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসতে উদ্যত। মণিপুর ছাড়া বর্মা ও থাইল্যাণ্ডেও তার দেখা মেলে। ও দুটি দেশে তাদের ওপরে ভূত ভর করে কিনা তা অবশ্য জানা নেই।

বিখ্যাত বন্যপ্রাণী বিশারদ ই.পি.গী. একদা এই ভূতে পাওয়া হরিণ দেখার জন্য মণিপুরে গিয়েছিলেন। ইম্ফলে পৌঁছে লোগটাক হ্রদে ভাসমান দ্বীপে কি করে যাওয়া যায় তার খবর নিতে গিয়েছিলেন বনবিভাগের দপ্তরে।

এখন তোমাদের বুঝিয়ে দিই ভাসমান দ্বীপটি কি ধরণের দ্বীপ। জলে জমা শ্যাওলা, আগাছা ও ঘাস, পলিমাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি ঘনীভূত স্তর রচনা করে। তা কয়েক ইঞ্চি থেকে শুরু করে কয়েক ফুট পর্যন্ত পুরু। তার ওপর দিয়ে হাঁটলে স্তরটি কাঁপতে থাকে। স্তরটি যেখানে পাতলা সেখানে পা ডুবে যাবার আশঙ্কা আছে, কাজেই খুব সাবধানে হাঁটতে হয়।

স্থানীয় মণিপুরীরা অবশ্য পারতপক্ষে এখানে পা দিতে চায় না, কারণ জলে ভাসমান এই স্তরটিকে ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে করে তারা। ভাসমান উদ্ভিজ্জের স্তর দিয়ে গড়া দ্বীপটিকে তারা ভৌতিক দ্বীপ নাম দিয়েছে। এই ভূতুড়ে দ্বীপে থাকে বলেই নাকি ভুরু শিং হরিণের ওপরে ভূত ভর করে।

এ হেন ভূতুড়ে দ্বীপে স্থানীয় মণিপুরীদের নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই বনবিভাগের অধিকর্তা একজন ফরেষ্ট রেঞ্জারকে নির্দেশ দিলেন গী সাহেবকে ঐ ভাসমান দ্বীপে নিয়ে যেতে।

বনবিভাগের একটি নৌকাতে করে ফরেষ্ট রেঞ্জার ও গী সাহেব ঐ দ্বীপে গিয়ে পৌছলেন। বনবিভাগ একটি খাল কেটে দ্বীপটাকে দুভাগে ভাগ করেছে। এই খাল দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গী সাহেব ও ফরেষ্ট রেঞ্জার একটি ছোট পাহাড়ের নীচে গিয়ে নৌকো বাঁধলেন। পাহাড়ের মাথায় বনবিভাগের বাংলো। এই বাংলোর বারান্দায় বসে দূরবীন দিয়ে সমস্ত দ্বীপ জুড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন গী সাহেব। কিন্তু ভাসমান উদ্ভিজ্জের স্তরের মধ্যে ভুরু শিং হরিণের পাল এমনি গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে যে কোথাও তাদের খুঁজে পান না তিনি।

ফরেষ্ট রেঞ্জার বললেন — ওদের খুঁজে পাবেন না মিস্টার গী, সব সময়ই ওরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

গী সাহেব বললেন, — সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে তা তো আর হয় না রেঞ্জার সাহেব, কখনো না কখনো চরতে বেরুবে নিশ্চয়ই। দিনের বেলায় যারা গা ঢাকা দিয়ে থাকে, তারা নিশ্চয়ই রাত্রে চরতে বেরোয়।

— আপনি কী রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান না কি মিস্টার গী। ফরেষ্ট রেঞ্জার শিউরে উঠলেন।

— নিশ্চয়ই। জ্যোৎস্না রাত, ওরা বেরিয়ে পড়লে দেখতে পাব নিশ্চয়ই।

— কিন্তু ওদের সঙ্গে তারাও যে আসবে জ্যোৎস্নার আলো বেয়ে ... বলতে বলতে ফরেষ্ট রেঞ্জারের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

— কারা রেঞ্জার সাহেব?

— তাদের নাম আমি মুখে আনতে পারবো না মিস্টার গী।

মৃদু হেসে গী সাহেব বললেন — মুখ ফুটে যাদের নাম আপনি করতে পারছেন না, তাদের আমি কিন্তু ভয় পাই না রেঞ্জার সাহেব।

এরপর ফরেষ্ট রেঞ্জার আর কোন কথা না বললেও দেখা যায় যে এখানে রাত কাটানোর সম্ভাবনা তাঁকে রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছে। সন্ধ্যা হতেই তিনি

ঢুকে পড়লেন বাংলোর মধ্যে। গী সাহেব বিস্তর ডাকাডাকি করেও বের রতে পারলেন না তাঁকে ঘর থেকে।

ফরেষ্ট রেঞ্জার বেরিয়ে না এলেও গী সাহেব এলেন, বারান্দায় বসে বসে অপেক্ষা করেন। জ্যোৎস্নায় অপরূপ হয়ে ওঠে দ্বীপটি। চারদিকে জলের রূপালী জৌলুসের মাঝখানে যেন একটি ছায়াঘন রহস্যময় পরিবেশ। তার মধ্যে কারা যেন নড়ে চড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না তাদের — মনে হয় যেন আলো ছায়ার কারসাজি।

হঠাৎ পাহাড়ের ঠিক নীচে ছায়ার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসে দশ বারোটি হরিণ। তাদের ভুরুর ওপরে শিং বাদামী চামড়ার ওপরে সাদা ছোপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে। জ্বলজ্বল করে তাদের কালো. চোখ। হঠাৎ তারা মুখ তুলে তাকায়। গী সাহেবের মনে হল যেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত মুখ তুলে তাকিয়ে থাকার পর তারা নাচতে শুরু করে। একই সঙ্গে যৌথ নৃত্যের ছন্দে তারা পা ফেলে ফেলে নাচতে থাকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন গী সাহেব। দৃশ্যটা এমনি অপ্রাকৃত যে গী সাহেব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না ...

হরিণরা চলে গেলে পর ফরেষ্ট রেঞ্জার গী সাহেবকে বললেন — ঐ হরিণগুলোর ওপরে ভূতেরা ভর করে বলেই ওরা নাচে। এ কথা আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন মণিপুরের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে,এমন কি জানোয়াররাও—

— বনের জানোয়াররাও বিশ্বাস করে। গী সাহেব অবাক হয়ে বললেন।

— হ্যাঁ মিস্টার গী। বিশ্বাস যে করে তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে ওদের নাচতে দেখলেই তারা ভয়ে পালায়। জানেন, বাঘ বা চিতাবাঘও ওদের নাচকে যমের মত ভয় করে। গী সাহেব বুঝতে পারেন এই ভুরু শিং হরিণগুলো খুবই চতুর। তাদের নাচতে দেখলে বন্য জন্তু জানোয়ার, মানুষ নির্বিশেষে সকলেই ভয় পায় বলে তারা নেচেই যায় — নাচই তাদের কাছে আত্মরক্ষার অস্ত্র।

মড়ার মাথা কথা বলে

রবিদাস সাহারায়

কলকাতার শহরতলীর হাসপাতালে মেডিকেল ছাত্রদের একটি হোস্টেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রাবাস ফাঁকা। সকলেই যার যার বাড়িতে চলে গেছে। শুধু রয়ে গেছে তিনজন ছাত্র — অমল, সুধীর আর নীহার। তারা ঠিক করেছে ছুটিটা নষ্ট না করে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। আগামী বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবে — এই তাদের সঙ্কল্প।

সত্যি তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। যে ছাত্রাবাস সব সময় ছাত্রদের হৈ-হুল্লোড়ে মুখরিত থাকত, তা এখন নীরব। কাজেই পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাবার মত কোন উপদ্রব আর নেই। এত বড় ছাত্রাবাসে রয়েছে মাত্র দু'জন ভৃত্য ও একজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। তারা গত পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল, তাই এবার যায় নি। তাতে অমল, সুধীর আর নীহারেরই সুবিধা হয়েছে। কারণ তাদের খাবার কোন চিন্তা নেই। সময় মত দু'বেলা তাদের আহার জুটছে আর পড়াশোনারও সময় পাচ্ছে প্রচুর।

অনেক রাত পর্যন্ত তারা মাঝে মাঝে পড়াশোনা করে। এনাটমি বিষয়টা খুব জটিল। তাই পড়াশোনার সুবিধার জন্য একটি মরা মানুষের মাথার খুলি তারা সংগ্রহ করেছে। এই মাথার খুলিটা থাকে তাদের পড়ার ঘরের টেবিলে। কলেজের এনাটমি ডিসেক্সন রুমে যে কঙ্কাল রয়েছে — সেই কঙ্কালেরই এটা একটা অংশ। প্রফেসরের অনুমতি নিয়ে এটা কয়েকদিনের জন্য নিয়ে এসেছে।

বেশ ভালভাবেই পড়াশোনা চলছে তাদের।

সেদিন রাত্রে সুধীর ও নীহার একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অমল একাই বসে বসে পড়ছে।

যখনকার কথা বলছি তখন সেই হোস্টেলে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। হ্যারিকেনের আলোয় ছাত্ররা পড়াশোনা করত।

রাত বোধহয় প্রায় বারোটা। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। অমল একা একা পড়ছিল। তার চোখেও বুঝি ঝিমুনি আসছিল একটু।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে অমল বই থেকে মাথা তুলল। ঘরে যেন কার পায়ের শব্দ। কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই। সুধীর ও নীহার তাদের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। মনের ভুল হয়েছে ভেবে অমল আবার পড়ায় মন দিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে না, মনে মনেই পড়ছে অমল। অর্থাৎ বইয়ের পাতার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পর আবার ঐ রকম একটা শব্দ শুনতে পেল অমল। পায়ের শব্দ। অমল আবার মুখ তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, এবারও কোন লোক দেখতে পেল না।

ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পেল টেবিলের উপর। তাকিয়ে দেখল মড়ার মাথার খুলিটা টেবিলের উপর থেকে আস্তে আস্তে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল অমল। মনে তার ভয়ও জাগলো। কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। একবার ভাবলো সুধীর আর নীহারকে ডাকবে, কিন্তু মুখের ভাষা যেন তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হল না। অসহায়ের মত বসে বসে শুধু দেখতে লাগলো।

মাথার খুলিটা উপর দিকে উঠছে — আরও উঠছে। চলে যাচ্ছে দেওয়ালের দিকে — যেদিকে পায়ের শব্দ সে শুনতে পেয়েছিল, সেখানে মানুষের মাথার সমান উঁচু একটা জায়গায় গিয়ে সেটা স্থির হয়ে রইল। তারপর সেই খুলির মুখ থেকেই যেন কথা বেরিয়ে এল — অমল।

অমল! মাথার খুলিটা তার নাম ধরে ডাকছে। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার!

কৌতূহল আর ভয় জাগল অমলের চোখে মুখে। তবু তাকিয়ে রইল সেদিকে। মাথার খুলিটা বলছে — অমল, আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে কেন এখানে এনে আটকে রেখেছ?

অমল হতভম্ব! তবু তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এল — তোমাকে আটক রাখিনি তো। তোমাকে তো টেবিলের উপরই রেখেছিলাম।

মাথার খুলিটা বলল — আমার শরীরটা রয়েছে লেবরেটরীর ঘরে। কিছুদিন আগে কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল ছেলে আমার ধড় থেকে মুন্ডটা খুলে ফেলেছিল। কেউ আর সেটা জুড়ে দেয়নি। ঐভাবেই রয়েছে সেই থেকে। তারপর তুমিই তো

সেদিন আমাকে এখানে নিয়ে এলে।

অমল বলল — তুমি কি আমাকে চেন? আমার নাম জানলে কেমন করে?

মাথার খুলিটা বলল — চিনব না কেন? এখানকার অনেককেই তো আমি চিনি। এই হাসপাতালেই এক বছর আগে আমার মৃত্যু হয়েছিল।

— কি বললে? এক বছর আগে তোমার মৃত্যু হয়েছিল এই হাসপাতালে?

— হ্যাঁ। আমার নাম ইয়াসিন। আমি 'বি' ওয়ার্ডে সাত নম্বর বেড-এ ছিলাম। ছুরি বেঁধা অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল পথের কয়েকজন লোক। তারপর আমার দলের লোকেরা খবর পেয়ে আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিল। যে ডাক্তারবাবু আমাকে চিকিৎসা করতেন তাঁর সঙ্গে তুমিও তো আমাকে দেখতে যেতে।

— তোমাকে ছুরি মেরেছিল কারা?

— আমাদের বিপক্ষ দল।

— বিপক্ষ দল মানে? তুমি কি পার্টি করতে নাকি? রাজনীতি করতে?

— না, ওসব নয়। আমাদের ছিল চোরাই মাল চালান করার পার্টি। আমিই ছিলাম লীডার। আমার কাছ থেকে আটঘাট শিখে নিয়ে দু'জন লোক দল ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পার্টি করল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। আমরা যেভাবে মালপত্র যোগাড় করতাম, সেভাবে যোগাড় করতে পারত না। তাই আমার উপর হল ওদের হিংসা।

— সেজন্য তোমাকে ছুরি মেরেছিল? তুমি পুলিশের কাছে ওদের নাম বলনি?

— হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু পুলিশ ওদের খুঁজে পায়নি। ওদের কি কোন আস্তানার ঠিক আছে?

— তোমাকে মেরে ওদের লাভ হয়েছিল কি?

— না, হয়নি। আমি যার কাছ থেকে চোরাই মাল সংগ্রহ করতাম তার নাম ছিল বদ্রিলাল। আমার দল থেকে চলে যাবার পর নাসিম আর আমজাদ বদ্রিলালের কাছে সেই মাল সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বদ্রিলাল ওদের বিশ্বাস করত না। বদ্রিলাল খুব কম মালপত্র ওদের দিত। তাই নাসিম আর আমজাদ ভেবেছিল,আমিই ওদের পথের কাঁটা। আমাকে না সরালে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। সেজন্যই মেরেছিল আমাকে।

— তারপর?

— আমি হাসপাতালে মারা গেলাম। আমাকে মর্গে পাঠানো হয়েছিল। আমার দলের লোকেরা সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল কবরখানায়। আমাকে কবর দিল।

কিন্তু ভাগ্যের কি খেলা। আমি যে চোরাই মালের কারবার করতাম, মরার পরও পড়ে গেলাম সেই চোরাইমাল পাচারকারীদের হাতে। আমার কঙ্কালটাও রেহাই পেল না। যেসব লোকেরা কঙ্কালের চোরা কারবার করে তারা একদিন আমার কঙ্কালটাও তুলে নিয়ে গেল। তারপর হাত বদল হয়ে আমার কঙ্কালটাও এসে গেল এই হাসপাতালে।

অমল স্তব্ধ হয়ে কথাগুলি শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল — তাহলে এখন সেই নাসিম আর আমজাদ খুব চোরাইমালের কারবার করছে?

ইয়াসিন বলল — না, সেই সুযোগ তাদের দেইনি। নাসিম হল দলের পান্ডা। তাকে একদিন রাত্রিবেলা পেয়ে গেলাম নির্জন জায়গায়। ধাপার মাঠের কাছে। তাকে গলা টিপে ধরলাম। সে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করল আমার সঙ্গে। কিন্তু পারল না। আমার সঙ্গে শক্তিতে সে পারবে কেমন করে? আমার গায়ের জোর চিরকালই ওর চাইতে বেশি। তবু লড়েছিল অনেকক্ষণ। ওর কাছে একটা ছুরি ছিল। সেই ছুরি নিয়েই সব সময় চলাফেরা করত। কিন্তু ছুরি দিয়ে আমাকে মারবে কেমন করে? ওর রক্ত মাংসের শরীর, আর আমি ছায়া হয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করছি। এক সময় ওকে খতম করে দিলাম। ওর ছুরি দিয়েই শেষ করলাম।

অমল চমকে উঠে বলল — এ্যাঁ, বল কি?

ইয়াসিনের মাথার খুলিটা বলল — হ্যাঁ। নাসিম এইভাবে খতম হল। এরপর আমজাদও একদিন ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। একটা চোরাইমাল পাচার করতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়ল। জেল হল তার। তারপর থেকে আমজাদ এই কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

অমল বলল — কিন্তু তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি কি চাও আমার কাছে?

ইয়াসিন বলল—আমি চাই মুক্তি।

— তোমাকে কিভাবে মুক্তি দেব আমি?

— শোন তাহলে। তোমাকে একটা গোপন খবর বলছি। তাতে তুমিও বেঁচে যাবে, আমিও ভালভাবে থাকতে পারব।

—বল, কি বলতে চাও তুমি?

— যে ঘরে কঙ্কালগুলি আছে সে ঘরের দারোয়ান কঙ্কালগুলিকে বিক্রি করে ফেলার মতলব করছে। যারা এইসব ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে সে। রাত্রে চোর হয়ে তারা চুরি করবে। তার আগে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলবে তারা। তারা চুরি করবে কঙ্কাল আর দু'একটি মূল্যবান যন্ত্র। আমার কঙ্কালটাকেও বাদ দেবে না তারা। তাহলে আমি মুণ্ডু ছাড়া হয়ে পড়ব।

— এই ব্যাপারে আমাকে কি করতে হবে?

— শোন, এই ছুটির সময়ে তোমাদের মেসে কোন ছাত্র নেই। তোমাদের টেবিলে আমার মুণ্ডুটা আছে। কাজেই এই চুরির পর তোমাদের উপরও দোষ পড়তে পারে। আমি চাই না তোমরা কোন বিপদে পড়ো। তুমি খুবই ভাল লোক। আমি জানি, এই হাসপাতালের বিছানায় থাকার সময় তুমি খুব যত্ন নিয়ে তোমার ডাক্তারের সঙ্গে থেকে আমাকে দেখতে। তাছাড়াও মাঝে মাঝে আমার খবর নিতে। অনেক ডাক্তারই বড় নিষ্ঠুর, তাঁদের মায়া মমতা নেই। তাঁরা রোগীদের ভাল করে দেখেন না। তুমি সেই ধরণের লোক নও। তাই তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমার এত আগ্রহ। তোমরা তিনজন এখানে আছ, এখনই তোমরা হাতে কোন অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ, আমার মুণ্ডুটা আমার কঙ্কালের সঙ্গে জুড়ে দিও। তাহলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। আমি এখন যাই।

ধীরে ধীরে মুণ্ডুটা আবার বাতাসে ভাসতে ভাসতে এসে টেবিলের উপর হাজির হল। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল অমল। একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা সে নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কি স্বপ্ন দেখছিল, না কি নিজেই এসব উদ্ভট কল্পনা করছিল।

বসে বসে ভাবতে লাগল অমল, এখন সে কি করবে? সুধীর আর নীহারকে জাগিয়ে তুলবে কি? যাবে কি সেই লেবরেটরী রুমের কাছে? ওদের জাগিয়ে তুলে বলবে কি নরমুণ্ডের বিচিত্র কাহিনী? ওরা হয়তো বিশ্বাস করবে না। পাগল বলেই তার কথা উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু ... স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না অমল। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে গিয়ে জাগিয়ে তুলল সুধীর আর নীহারকে। বলল — ওঠ্ ওঠ্ শীগ্গীর।

ধড়মড় করে উঠে বসল সুধীর আর নীহার। ঘুম ঘুম চোখেই বলল — কি হয়েছে রে অমল?

অমল বলল — চল, লেবরেটরী রুমের দিকে যাই। ওখানে চোর এসেছে।

— চোর? কে বলল?

— হ্যাঁ, আমি খবর পেয়েছি।

— লেবরেটরীর ঘরে চোর এসেছে তো আমাদের কি?

— কঙ্কাল চুরি করতে এসেছে চোর। কঙ্কাল চুরি হলে আমাদের উপর হয়ত দোষ পড়বে। চল, এখন গেলে চোরকে তাড়ানো যাবে।

— চোর যদি আমাদের ঠেঙায়?

— সেজন্য তৈরী হয়ে যেতে হবে। লাঠি নিয়ে চল।

লাঠি নেওয়া সত্যি দরকার। কিনতু লাঠি কোথায় পাবে? হকি ষ্টিক ছিল, তাই তিনজন তিনটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লেবরেটরীর কাছে এস তারা তিনজনেই তাজ্জব। দেখল, সত্যি সেখানে চোর হানা দিয়েছে। দারোয়ানকে দড়ি বেঁধে বারান্দার এক পাশে ফেলে রেখে লেবরেটরীর দরজা চাবি দিয়ে খুলে ফেলেছে চোরেরা।

অমল, সুধীর আর নীহার হৈ হৈ করে শোরগোল তুলল। হকি ষ্টিক দিয়ে আঘাত করতে লাগল মাটির উপর—যাতে চোরেরা ভয় পায়। চোরেরা ভয় পেলেও বাঁচবার জন্য রুখে এল অমল, সুধীর আর নীহারের দিকে। কিন্তু তাতে সুবিধা করতে পারল না। হৈ চৈ শুনে ততক্ষণে এদিক ওদিক থেকে আরও লোক এগিয়ে এসেছে। তিনজন চোরই ধরা পড়ল।

মস্ত বড় একটা চক্রান্তের সূত্র ফাঁস হয়ে গেল। সেই সূত্রেই ধরা পড়ল কঙ্কাল চোরা-কারবারীর দল।

দরোয়ান বুঝতে পারল তারও অব্যাহতি নেই। সে গোপনে দোষ স্বীকার করল অমল, সুধীর আর নীহারের কাছে। তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনদিন সে এমন কাজ করবে না।

দরোয়ানের চাকরী রয়ে গেল। কিন্তু এসব কাণ্ডকারখানার মূলে যে ইয়াসিনের প্রেতাত্মা, একথা সুধীর আর নীহার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। তারা বলল, তুই নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিলি। মরা মানুষের মাথার খুলি কথা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি কিভাবে?

অমলও বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপার যে সত্যি ঘটেছিল। এ

ব্যাপার না ঘটলে চোরের খবরই বা সে জানত কেমন করে?

অমলের কৌতূহল এরপর সত্যি খুব বেড়ে গিয়েছিল। সে হাসপাতালের খাতাপত্র ঘেঁটে বের করেছিল এক বছর আগে মহম্মদ ইয়াসিন নামে সত্যি একজন রোগী ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সে ছিল 'বি' ওয়ার্ডে সাত নম্বর বেডে। তিন দিন পর তার মৃত্যু হয়েছিল।

ঘটনা খুবই আশ্চর্য।

যাঁরা পরলোক বিশ্বাস করেন তাঁরা হয়তো বলবেন, যে ঘৃণ্য কাজ করত ইয়াসিন, সেই কাজের উপর তার বিতৃষ্ণা এসেছিল। সে নিজেও হয়েছিল সেই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের শিকার। তাই তার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াত সেই ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দেবার জন্য।

অমল কিন্তু ইয়াসিনের প্রেতাত্মার অনুরোধ রক্ষা করেছিল। লেবরেটরী রুমে সে ভাঙা কঙ্কালের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল তাঁর খণ্ডিত মুন্ড। তাতে ইয়াসিনের আত্মার হয়ত তৃপ্তি হয়েছিল।

ফ্রান্সিসের অভিশাপ

শিশিরকুমার মজুমদার

বসুস্ কিউরিও শপের মালিক পরমেশবাবু প্রমাণ সাইজ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু অবাক হলেন। মান্ধাতার আমলের জিনিস এটা। একটা স্ট্যান্ডের ওপর এমনভাবে দাঁড় করানো আছে যে ইচ্ছা করলেই আয়নাটাকে সামনে পেছনে হেলান যায়। এপাশে ওপাশে বাঁকানো যায়। এটা যে কোনও সাহেব সুবোর বাড়ির জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। পুরো পোশাক পরে বের হবার আগে সাহেবরা নিজেদের সাজ পোশাক এতে ভাল করে দেখে নিত।

অকশন মার্টের কেরানী রামরতনবাবুকে আড়ালে ডেকে পরমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে, ওই আয়নাটার মিনিমাম দাম কত রেখেছ? কতয় ছাড়বে বল তো?

রামরতনবাবু একটু থমকে গেলেন। বললেন, বোসবাবু, ও আয়নাটা আপনি কিনবেন না। আপনি আমাদের পুরনো খদ্দের, আপনাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য। ওটা জন সিবাস্টিনের বাড়ির জিনিস।

অবাক পরমেশবাবু বললেন, তাতে কি? সাহেববাড়ির কত পুরনো জিনিসই তো আমি কিনেছি। কিনবও আরো কত। জন সিবাস্টিনের জিনিস হলে তো আরও ভাল। ও তাহলে আসল বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না। একশ-দেড়শ বছরের পুরনো হবে।

তা হয়তো হবে — বললেন রামরতনবাবু, সঠিক হিসাব বলতে পারব না। তবে যা শুনেছি, ওই জন সিবাস্টিন লোকটা তেমন ভাল লোক ছিল না। সামান্য টাকার জন্য ও বহু লোকের সর্বনাশ করেছিল। পয়সাও কামিয়েছিল অনেক। কিন্তু সেই পাপের পয়সা সে নাকি বেশি দিন ভোগ করতে পারেনি।

একথা শুনে পরমেশবাবু হাসলেন। বললেন, তাতে কি, লোকটা খারাপ ছিল। পাপ কাজ করত। কিন্তু তা বলে তো তার আয়নায় তার পাপের ছায়া পড়েনি, যে থেকে থেকে তা ফুটে উঠবে। ও আয়না আমি কিনব। অমন একটা গল্পের নায়কের আয়না, দাও বুঝে বেচতে পারলে অনেক লাভ রাখতে পারব।

নিলামে ওটা নিয়ে তেমন হাঁকাহাঁকি হল না। নিয়ে নিলেন পরমেশবাবু। চেক লিখে দিয়ে রামরতনবাবুকে বললেন, ওহে, ওটা এখন আমারই। রামু ঠেলাওয়ালাকে দিয়ে কালই ওটা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। ভাল কথা, তুমি যেন তখন কি সব আরও বলতে গিয়ে বললে না মনে হল। এখন বল তো কি রহস্য ঘিরে আছে ওই আয়নাটাকে।

রামরতনবাবু বেশ ভয়ের সঙ্গেই বললেন, কাজটা আপনি ভাল করলেন না। শুনেছি, ওই আয়নাটা ভয়ের। কেন, তা অবশ্য আমি জানিনা। যে বাড়ি থেকে ওটা আনা হয়েছিল, সে বাড়ির এক বুড়ি বলেছিল, ওটা নাকি গত একশ পঞ্চাশ বছর ঘরের এক কোণে ছেঁড়া ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। কেউ ওতে মুখ দেখেনি। কারণ বাড়ির সবাই জানে ওটার মধ্যে কি এক ভয়ঙ্কর জাদু আছে, যা কোনও মানুষের ভাল করে না।

পরমেশবাবু বেজায় খুশি হয়ে বললেন, ওহে এই গুজবের কথাটা তুমি ভাল করে ইংরেজীতে লিখে টাইপ করে দাও তো আমাকে। যা খরচ লাগে তা আমি দেব। জান তো, যা কিছু আমি কিনি তা আবার বিক্রি করব বলেই কিনি। আমার কিউরিও শপে দেশ-বিদেশের বহু খদ্দের আসে। অমন একটা আয়নার সঙ্গে জন সিবাস্টিনের নাম, আর এমন একটা গল্প জুড়ে দিতে পারলে ও আয়না আমি পাঁচগুণ লাভে বিক্রি করতে পারব হে। ভাল কথা, ওই জন সিবাস্টিন লোকটাই বা কে ছিল? থাকত কোথায় সে?

মাথা চুলকে রামরতনবাবু বললেন, সে তো কুখ্যাত জলদস্যু ছিল। গঙ্গায় তার দৌরাত্ম্যে এক সময় নৌকো চলাচল নাকি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। এ অবশ্য আমার শোনা কথা।

আয়নাটা পরমেশবাবু প্রথমে তাঁর বাছাই ঘরে রাখলেন। রামরতনবাবু কথা রেখেছেন। আয়নার সঙ্গে আয়নার ইতিহাসও কোম্পানীর কাগজে টাইপ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন কল কব্জাগুলো তেল দিয়ে নরম করতে হবে। কাঠের ফ্রেমে পালিশ ধরাতে হবে। তারপর কাচ সাফ করে ওটাকে বিক্রির ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দেবেন উনি। পাঁচ গুণ নয়, হয়তো বিশ গুণ দামও পেতে পারেন, যদি তেমন কোনও খদ্দের এসে পড়ে।

বুধনকে ডেকে বললেন, ওরে সাবান জল গুলে আগে কাচটা ভাল করে সাফ করে ফেল। তারপর আলি মিস্ত্রিকে খবর দে। আজ রাতের মধ্যেই ওটাকে ফ্রেম

বার্নিস করে দিয়ে যাক। কাল ছুটির দিন আছে, শো রুমের ভাল জায়গায় রাখলে কালই বিক্রি হয়ে যাবে।

সারা দিন নিলামের ধকল গেছে। তাই ক্লান্ত ছিলেন পরমেশবাবু। ওই একটা আয়নাই তো নয়, আর যে সব মূর্তি, পুরনো ঘড়ি কিনেছিলেন, সেগুলো জায়গা মত সাজাতে লাগলেন। জিনিসগুলো ঠিক জায়গামত রাখার ওপরেও বিক্রি অনেকটা নির্ভর করে। মনে মনে তাই আয়নাটাকে যে কোথায় রাখবেন সে কথাই ভাবছিলেন উনি।

হঠাৎ ও ঘর থেকে বুধনের চিৎকার ভেসে এল, চোর চোর। যেমন আচমকা সে চিৎকার তেমনি হঠাৎই তা আবার থেমে গেল। সে মাত্র ক'সেকেন্ডের জন্য। তারপর বিকট একটা আঁ-আঁ চিৎকারের সঙ্গে কিছু একটা পড়ার শব্দ।

চোর চোর শব্দে অবাকই হয়েছিলেন পরমেশবাবু। চারদিক বন্ধ বাড়ির মধ্যে চোর ঢুকবে কি করে? কিন্তু যেভাবে শেষ হল ব্যাপারটা তাতে প্রায় ছুটেই উনি বাছাই ঘরে পৌঁছালেন। কাজের লোক হলধরও ছুটেই এসে হাজির হল। তার চোখে মুখে বেশ আতঙ্ক মাখানো। বাবুকে দেখে সে বলল, কি হল বাবু? বুধন যেন চেঁচাল!

পরমেশবাবু দেখলেন, জলের বালতিটা উল্টেছে। সাবান গোলা জলের মাঝখানে মেঝেতে পড়ে বুধন বেহুঁস হয়ে গোঁ গোঁ করছে। চারদিক যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি আছে। চোরের ব্যাপারটা নেহাতই কল্পনা। কিন্তু বুধনের হল কি? কি দেখে ও অমন অজ্ঞান হয়ে গেল।

ধরাধরি করে ওকে নিয়ে গিয়ে পাখার নিচে বেঞ্চে শুইয়ে দিলেন পরমেশবাবু। ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিলেন চোখে মুখে। ফোন করে দিলেন ডাক্তার বিশীকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে বুধন ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল।

পরমেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল রে বুধন?

কোনও কথা বলল না বুধন। তেমনিভাবেই এদিক ওদিক চাইতে লাগল। তা দেখে অবাক পরমেশবাবু বললেন, চোর এখানে আসিবে কোথা থেকে রে? ওই আয়নাটা এদিক ওদিক ঘোরে, সামনে পেছনেও হেলে। কাচ সাফ করতে করতে তুই অন্যমনস্কের মত হঠাৎ তোর নিজের ছায়া দেখেই চোর ভেবে অমন চেঁচিয়ে উঠেছিলি। আয়নাটা আবার তোর হাতের ধাক্কায় ঘুরে যেতে চোরটাকে, মানে তোর ছায়াকে আর তুই দেখতে পাসনি। তাই ভয়ে ...

কথা শেষ করতে পারলেন না পরমেশবাবু। বুধন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নাভরা গলায় বলল, বাবু ও সীসা ভাল না। ওটা বাইরে ফেলে দিন।

থমকে গেলেন পরমেশবাবু। এ কথার মানে? তবে কি রামরতনের কথাই ঠিক। মনের ভাব চেপে রেখে উনি ধমকে উঠলেন, আয়নার কথা আর তোকে ভাবতে হবে না। ওটা আমি নিজেই সাফ করব। যা, তুই তোর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। হলধর, একে নিয়ে যাও। ডাক্তারবাবু আসছেন দেখতে। যা দাওয়াই লাগে তা আমি দেব। যা, যা, এখন শুয়ে পড় গিয়ে।

হলধর বুধনকে তুলে নিয়ে গেল। ওরা চলে যেতেই হাঁক দিয়ে পরমেশবাবু নতুন কাজের লোক মতিকে ডাকলেন। আয়নাটা তাকেই সাফ করতে বলবেন ভাবলেন। সবার আগে ঘরটাও সাফ করতে হবে।

মতি বুধন আর হলধরের আত্মীয়। ওরাই ওকে কাজে এনেছে। কিউরিও শপের কাজ, খুব বিশ্বাসী চেনাজানা লোক না হলে এটা ওটা সেটা প্রায়ই চুরি যায়। আর চুরি মানেই তো লোকসান।

এই শপের শেষ চুরির ব্যাপারটা অবশ্য পরমেশবাবুকে বেশ ভাবিয়েছিল। একটা শ'চারেক বছরের পুরনো সোনার মোহর। দাম নেহাত কম নয়। তালা লাগানো শো কেস থেকে সেটা একদিন বেমালুম উধাও হয়ে গেল। যা এমনিভাবে যায়, তার আর হদিশ পাওয়া যায়না। সেই থেকেই বুধনের মনে বোধহয় চোরের আতঙ্ক ঢুকেছিল। তার ফলে আয়নায় নিজের ছায়া দেখেই এমন কান্ড বাধিয়েছে।

মতি আসতেই পরমেশবাবু ওকে কি কি কাজ করতে হবে তা বলে দিলেন। নিজেও হল ঘরে গেলেন জিনিসগুলো ফের সাজাতে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ডাক্তার বিশীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওঁকে। ডাক্তার বিশী আবার বেজায় গপ্পোবাজ। আজ তো আবার রুগীর সঙ্গে এমন ঘটনার যোগ দেখে বিরাট গপ্পের খোরাক পেয়ে যাবেন। আয়নাটাও না আবার দেখতে চেয়ে বসেন।

হেঁকে মতিকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বললেন পরমেশবাবু। ওঁর হাঁক শেষ হতেই হুড়মুড় করে মতি এসে হাজির ওঁর সামনে। ও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, বাবু, ও সীসা জাদু সীসা। ও সীসা আমি সাফ করতে পারব না। মেঝের জল মুছে দিয়েছি। আমি যাচ্ছি।

অবাক পরমেশবাবু ধমকে উঠলেন, কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ বাবু, বলল মতি, ও সীসার ভেতর ছায়া নড়ে।

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন পরমেশবাবু। যা ভেবেছেন ঠিক তাই। আয়নাটার অদ্ভুত নড়াচড়ায় ছায়া নড়ছে দেখেই দুই বীরপুরুষ কাত। ভাল জিনিসই কিনেছেন উনি। বললেন, ঘরের মেঝে ঠিকমত সাফ করেছিস তো? সাবান জলের বালতিটা রেখে দিয়ে যা। বাকি কাজ আমি করব।

বালতিটা ফেলেই যেন পালিয়ে বাঁচল মতি। ঘর থেকে বের হতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু না বলেই বোকার মত মুখ করে চলে গেল।

হলঘরের জিনিসগুলো সাজানো শেষ হতেই ডাক্তার বিশীর আসার খবর পেলেন উনি। হলধরকে বাকি কাজগুলো দেখতে বলে, হাত মুখ ধুয়ে বসার ঘরে হাজির হলেন।

ডাক্তার বিশী ওঁকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন, দাদা, দারুণ একখানা গল্প শুনলাম আপনার বুধনের কাছে। ও তো হলফ করে বলেছে আয়নার মধ্যে অন্য আর একজনকে নড়তে দেখেই ও চোর ভেবেছিল। পরে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ভালই আছে এখন। যা ওষুধ দেবার তা দিয়েছি। রাতে ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দাদা আয়নাটা তো আমাকে একবার দেখতে হচ্ছে। আয়নার মধ্যে ছায়া নড়ে — এই তো অদ্ভুত কথা, তার ওপরে সে ছায়া আবার অন্যের। চলুন চলুন ব্যাপারটা না দেখলে শান্তি নেই।

চা দিতে বললেন পরমেশবাবু। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আয়নার নড়াচড়ার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিতে চেষ্টা করলেন। বোঝালেন কিভাবে আয়নার ভেতরের ছায়া নড়ে।

সব শুনে খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ডাক্তার বিশী বললেন, আপনি বলছেন আপনার আয়নাটা এমনভাবে কলকব্জা আর বল বেয়ারিং-এর ওপরে মাউন্ট করা যে তার ফলে ওটাতে একটা জাইরোস্কোপিক মুভমেন্ট ঘটানো সম্ভব। আর তা ঘটছে বলেই মনে হচ্ছে ছায়া নড়ছে। এ না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওই অপরের ছায়ার ব্যাপারটাকে কি ব্যাখ্যা দেবেন?

হাসতে চেষ্টা করে পরমেশবাবু বললেন, ওর ব্যাখ্যা একটাই। ভয়ে ভুল দেখা। আয়নায় অন্যের ছায়া নড়বে, একি সম্ভব কথা?

মাথা নাড়তে থাকলেন ডাক্তার বিশী। বললেন, যে ব্যাখ্যাই দিন দাদা, ও আয়না দেখার মত জিনিস। চলুন ওটা নিজের চোখে দেখব। দেখি আমার বেলায় কার ছায়া নড়ে ওর ভেতরে।

হলঘরের দরজার কাছে পৌঁছেছেন ওঁরা, ঠিক তখনি হলঘর থেকে ছুটে

বেরিয়ে এল হলধর। ওর চোখে মুখে আতঙ্ক। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবু, সত্যি আয়নায় জাদু আছে। মতি কোথায়, মতি? সে আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। সে বোধহয় বাবু এতক্ষণে পালিয়েছে।

অবাক পরমেশবাবু ধমকে উঠলেন, কি আবোল তাবোল বকছিস? আয়নায় জাদু তো মতি পালাবে কেন?

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে হলধর বলল, তাইতো বাবু বুঝছি না। আয়নায় স্পষ্ট দেখলাম, মতি চুপি চুপি বাবরের সোনার মোহরটা চুরি করল। একা। হ্যাঁ বাবু, স্পষ্ট দেখলাম আয়নায়।

কি বলছিস তুই। সে মোহর তো চুরি গেছে আজ থেকে প্রায় তিন মাস আগে। তার ছায়া আজ তুই দেখবি কি করে? ধমকেই বললেন পরমেশবাবু।

ডাক্তার বিশী হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এই হলধর, গাঁজা ভাঙ খাও নাকি?

বোকার মত তাকিয়ে রইল হলধর। তারপর কেমন করে যেন বলল, বাবু, নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না। স্পষ্ট দেখেছি। মতি কোথায়, তাকে ডাকুন।

ওর কথায় আর তেমন কান দিলেন না পরমেশবাবু। বললেন, মতি গেছে বুধনের ওষুধ আনতে। ফিরলে ধরিস তো তাকে।

অ্যাঁ, মতি ওষুধ আনতে গেছে। সর্বনাশ বাবু, সে আর ফিরবে না — বলল হলধর।

না ফিরলে থানায় যাস। বিরক্তিতে কথাগুলো বলে পরমেশবাবু ডাক্তার বিশীকে ডাকলেন, আসুন আসুন, চলুন জিনিসটা দেখাই। খেয়াল করেছেন, এরাই এসব দেখছে। আমি নিজে কিন্তু এখনও কিছুই দেখিনি। দেখব কি করে? ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটা যে আমি জানি। জানি, কিভাবে ওর মধ্যে ছায়া নাচে।

হলধরকে ওখানে বোকার মত দাঁড় করিয়ে রেখেই ওঁরা বড় ঘরটায় ঢুকলেন। পরমেশবাবু বললেন, ওটা কিন্তু এ ঘরে নেই ডাক্তারবাবু। ওটা আছে আমার বাছাই ঘরে, ওপাশে। যান, একলা দেখুন গিয়ে। দেখুন, আপনার বেলায় আবার কার ছায়া নাচতে শুরু করে।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার বিশী। বললেন, মন্দ বলেননি। অমন আয়নায় একাই মুখ দেখা উচিত। আপনি দাঁড়ান। আমি দেখে আসি, আমার বেলায় কার ছায়া দেখা যায়।

হাসতে হাসতেই পাশের ঘরে চলে গেলেন ডাক্তার বিশী।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট ওদিকে আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। পাঁচ মিনিট পরে পরমেশবাবু মহা অস্বস্তিতে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল ডাক্তার বিশী? শেষে কি আপনিও আপনার নিজের ছায়ার নড়াচড়া দেখে ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ব্যাপার কি? সাড়া শব্দ নেই কেন?

তবুও কোন উত্তর পেলেন না পরমেশবাবু। মানে? ডাক্তার বিশী তো আর কাজের লোকদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন। তবে কেন উনি অমন থমকে রয়েছেন।

তাড়াতাড়ি ওঘরে ঢুকে জীবনে সব থেকে বেশি অবাক হলেন পরমেশবাবু। আয়নাটার দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন বিশী। ওঁর মুখ চোখ যেন রক্তশূন্য। আতঙ্ক, ভয় আর দুশ্চিন্তা নিয়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করেই তাকিয়ে আছেন আয়নার দিকে।

কি দেখছেন উনি ওই আয়নাটাতে। তাড়াতাড়ি পরমেশবাবু ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট দেখলেন, দুটো ছায়াই ফুটে উঠেছে আয়নাটাতে নিজের আর ডাক্তারের। আর কোন কিছুই নেই, তবে?

ডাক্তার বিশীর কাঁধে হাত রেখে ব্যস্ত হয়ে পরমেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হল ডাক্তার বিশী? আপনিও আয়নায় অপরের ছায়া নড়তে দেখেছেন নাকি? এমন ভূত দেখার মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দেখুন, দেখুন, আমার আর আপনার ছায়া ছাড়া আয়নাটাতে আর কোন ছায়া নেই।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন ডাক্তার বিশী। বললেন, আমাকে আমার গাড়িতে তুলে দিন পরমেশবাবু। বাড়ি যাব। অসুস্থ বোধ করছি।

কি হল আপনার? ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরমেশবাবু। কিন্তু মনের কৌতূহল চাপতে না পেরে বললেন, শেষে আপনিও কি ওদের দলে ভিড়লেন।

উত্তরে তেমনি কাঁপা গলায় ডাক্তার বিশী বললেন, বাড়ি, বাড়ি যাব আমি। ড্রাইভারকে বলে দিন, যেন সোজা আমাকে বাড়ি নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হল না। মতি ওষুধ নিয়ে ফিরল না। হলধরও আর কিছুতেই ওই আয়নাটা সাফ করতে রাজি হল না। রাত অনেক হয়েছে দেখে কিউরিও শপে তালা দিয়ে কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ করে দিলেন পরমেশবাবু। এসব করার আগে অন্তত বার চারেক তিনি নিজে গিয়ে ওই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের ছায়াই শুধু নাচতে দেখেছিলেন, তাও যখন উনি আয়নাটা নিজের হাতে নাড়াচ্ছিলেন তখন। তাছাড়া আর কোনও ছায়া দেখেননি আয়নায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলেন পরমেশবাবু। সেই আমেরিকানটাকে কালই

খবর পাঠাতে হবে। অন্য কেউ দেখার আগে রে জনসনই দেখুক ওটা। এত সব ঘটনা ওটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তা শুনিয়ে দাঁও মারা যাবে। বেশ খুশি মনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

পরদিন বাইরের ঘরে বসে রে জনসনের চিঠিটা টাইপ করছেন, এমন সময় কোনরকম জানান না দিয়েই এক বৃদ্ধা মেম ঘরে ঢুকে পড়লেন। অবাক পরমেশবাবু কিছু বলার আগে বৃদ্ধা ওঁর সামনের চেয়ার টেনে বসে বললেন, আমার নাম ডরোথী সিবাস্টিন। জন সিবাস্টিনের যে আয়নাটা তুমি কিনেছ, সে সম্বন্ধে কিছু কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। তার আগে বলি, ওই কুখ্যাত জন সিবাস্টিন আমারই পূর্বপুরুষ। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিন।

মনে মনে খুশিই হলেন পরমেশবাবু। বললেন, ম্যাডাম, আপনি এসেছেন দেখে খুশি হলাম। একটা কথা বলি, যাই বলুন না কেন ধীরে সুস্থে বলবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তা টাইপ করে নেব। বিশেষ করে ওই আয়নাটা আর জন সম্বন্ধে। কথার শেষে তাড়াতাড়ি মেশিনের কাগজ বদল করলেন পরমেশবাবু।

বৃদ্ধা বললেন, আমিই এই বংশের শেষ মানুষ। আমার পর আর কেউই থাকবে না। আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই যে কটা দিন বাঁচব ওই পুরনো জিনিস বিক্রী করেই বাঁচব। সব শেষে বাড়িটা। সে কথা থাক। অকশন হাউসেই জানলাম, আয়নাটা তুমি কিনেছ। তাই তোমার কাছে এলাম।

পরমেশবাবু বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বুঝলাম না আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে? দাম চুকিয়ে ক্যাশমেমো নিয়েছি। ওই আয়নার আমিই এখন মালিক। ফেরত চাইলে পাবেন না, তা জেনে রাখুন।

না, না — বললেন বৃদ্ধা, ও আর ফেরত চাই না। ওটা দিয়ে আমি আর কি করব। তবে কি জান, ওই আয়নাটা ঘিরে বিশ্রী লোককথা চালু আছে। আর তা চালু আছে বলেই, আমাদের বংশের মাত্র দু'জন ছাড়া আর কেউ ও আয়নায় মুখ দেখেনি।

— দুজন মুখ দেখেছিল বললেন? তারা কারা?

— প্রথম জন সিবাস্টিন নিজে, আর দ্বিতীয় জন আমার ঠাকুর্দা।

— জন সিবাস্টিন আসলে কি করতেন? অনেক আজেবাজে কথা এরই মধ্যে আমার কানে এসেছে।

— জানি না কি শুনেছেন। তবে তিনি আসলে ছিলেন জলদস্যু। ঠিক কথা বললে বলতে হবে জলদস্যুদের জাহাজের একজন সাধারণ নাবিক। বহু যুগ

আগে জাহাজ ছেড়ে এদেশের মাটিতে বাসা বাঁধেন। শুরু করেন দাস ব্যবসা। বাংলার দক্ষিণ থেকে ছেলে মেয়েদের ধরে এনে হাত ফুটো করে বেঁধে চালান দিতেন বিদেশে। বাঙালি দাসদাসীর চাহিদা ছিল ইউরোপে। জন এই ব্যবসাতেই কোটিপতি হয়ে যান। তখন নিজেই জাহাজ কেনেন। দাস ব্যবসার সঙ্গে ফের শুরু করে দেন জলদস্যুগিরি। লোকে বলত, তাঁর দয়া মায়া বলতে নাকি কিছুই ছিল না। টাকার জন্য যা খুশী তাই করতেন। শেষে এমন হল, লোকে তাঁর নাম মুখে আনতেও ভয় পেত।

এমন যখন তাঁর অবস্থা, চরের মুখে খবর পেলেন বড় নদীর ধারে এক বিদেশী কুঠি বানিয়ে খুব জাঁকজমক করে বাস করছেন। তাঁর অনেক টাকা। জন সে কুঠি লুঠ করার ব্যবস্থা পাকা করলেন। রাতের অন্ধকারে নদীপথে গিয়ে কুঠি ঘিরে ফেললেন। চারদিক কাঁপিয়ে শেষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুঠিবাড়ির ওপর। যারা বাধা দিল, একে একে মরল। বাড়ির মালিক নিজে বন্দুক হাতে সব কিছু রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পারলেন না। দরজা ভেঙে বীরদর্পে ঘরে ঢুকলেন জন।

তাঁকে দেখে বাড়ির মালিকের স্ত্রী ছুটে গিয়ে ওই আয়নাটার পেছনে লুকিয়েছিলেন। মালিক হাতের তলোয়ার ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, জন আমাকে তুমি মেরো না। দোহাই তোমার।

এ কথা কিন্তু জনের কানে যায়নি। হাতের তলোয়ারটা আমূল বসিয়ে দিলেন বিদেশীর বুকে। আর্তনাদ করে উঠলেন বিদেশী ভদ্রলোক, জন, জন, এ তুমি কি করলে।

বুকের ওপর পা রেখে তলোয়ারটা টেনে বার করতে গেছিলেন জন, তখন এক ঝলক নজর পড়েছিল হতভাগ্যের ওপর। থমকে গেছিলেন জন। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে ওঁরই ছোট বোনের স্বামী, যে ইচ্ছা করেই কোনও সম্পর্ক রাখত না জনের সঙ্গে। তা বলে জন তো তাকে হত্যা করতে চাননি। কি করতে কি হয়ে গেল।

ছোট বোনের স্বামী ফ্রান্সিস, শেষবারের মত চোখ মেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, জন, আমার সর্বনাশ করে তুমি যদি বড়লোক হতে পার তো তাই হও। কিন্তু নিজের কথা কি কখনও ভেবেছ? ভেবেছ, কোন নরকে তুমি নেমে যাচ্ছ? তাকিয়ে দেখ ওই আয়নাটার দিকে। নিজকে দেখতে পাবে ঠিকভাবে। কথার শেষে ফ্রান্সিসের মাথা ঢলে পড়ল।

জন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তাঁর ছায়া পড়েছিল ওই আয়নায়। আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল জন। ও কে? ওই আয়নার মধ্যে থেকে ওঁরই দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে! কে ও?

জন তাঁর বোনকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। পারেন নি, কারণ তিনি কাউকে কিছু না বলেই কোথায় চলে গেছিলেন, আর ফেরেন নি।

আয়নাটা জন তাঁর নিজের ঘরেই রেখেছিলেন। কয়েক দিন পরেই সবাই শুনল, রাতের অন্ধকারে জন নিজের ঘরে চেঁচাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ভয়ে আর্তনাদ করছেন। ঘরময় ছুটোছুটি করছেন। শেষে একদিন রাতে ঘরের দরজা খুলে ছুটে বারান্দায় বার হয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেকে বললেন, শোন, আমার অতীত, ওই আয়নাটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে তাড়া করছে। উঃ কি বীভৎস অতীত।

জন বদ্ধ পাগল হয়ে গেছিলেন। বাড়ি ঘর টাকা পয়সা, জলদস্যুর নৌকো রইল পড়ে, একদিন জন মারা গেলেন।

তারপর থেকে ওই আয়নাটা এ বংশের আর কেউই বহুদিন ব্যবহার করেনি। ওটাকে মোটা কাপড়ে মুড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ওই আয়নাটার সঙ্গে এ বংশের আদি পুরুষ জনের এই গল্প আমাদের বংশে বরাবর চালু আছে। শোনা যায় আমার ঠাকুর্দা এই বংশের আর্থিক অবস্থা আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন।

তিনি পুলিশে চাকরী করতেন। তখন দেশে বিপ্লবীদের কাজ আরম্ভ হয়েছে। তাঁরা জীবন পণ করে বিদেশী সরকারকে হটাবার চেষ্টা শুরু করেছেন। ঠাকুর্দা তাড়াতাড়ি উন্নতির আশায় ওই সব বিপ্লবীদের পিছু নিলেন। দু-চার জনকে ফাঁসিতেও ঝোলালেন। সরকারে তাঁর খুব নাম ডাক হল। তিনিই আবার নতুন করে ঘরবাড়ি সাজালেন।

একদিন আয়নাটার ঢাকনা খুলে আবার ওটাকে নিজের শোবার ঘরেই নিয়ে গিয়ে রাখলেন ঠাকুর্দা। সবাইকে বললেন, কুসংস্কার উনি মানেন না।

কিন্তু তিনিও সে রাতে ওই আয়নার মধ্যে কি দেখলেন কে জানে। তাঁর আর্তনাদ শুনে সবাই ঘরে গিয়ে দেখল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

জ্ঞান ফিরলে দু-চার কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন। যার মানে, ওই আয়নাটাকে আবার ঢেকে দিতে হবে। এমনভাবে তা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতেও আর কেউই ওটাতে নিজের ছায়া না দেখতে পারে। তাঁর মুখে শেষ কথা ছিল, সুজাগড়ের জঙ্গল, সুজাগড়ের জঙ্গল।

সুজাগড়ের জঙ্গলেই তিনি এক বিপ্লবী দলকে কোণঠাসা করেছিলেন বুদ্ধি করে। ভেবেছিলেন তাদের বন্দী করে বিচারে পাঠাবেন। কিন্তু স্থানীয় ইংরেজ সেনাপতি তাঁর কোনও কথা না শুনে গোটা দলটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। এ খবর কেউ জানত না। আমরা শুনেছিলাম ঠাকুর্দার এক দুর্বল মুহূর্তে।

সেই থেকেই ওই আয়নাটা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। নিলামওয়ালাদের ডাকতে তারা বলল, ওসব বুজরুকি তারা মানে না। সব জিনিসের সঙ্গে আয়নাটাও তারা তুলে নিয়ে গেল। একটানা এতক্ষণ কথা বলে বৃদ্ধা থামলেন।

পরমেশবাবু টাইপ মেশিন থেকে আঙুল তুলে বললেন, ধন্যবাদ, গল্প আপনি চমৎকার বলেছেন। আচ্ছা আয়নায় কে ঠিক কি দেখেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলে যাননি?

না। বললেন বৃদ্ধা। জন সিবাস্টিন যে সঠিক কি দেখেছিলেন তা আমাদের বংশের কারও ডায়েরীতে পাওয়া যায়নি। তবে ঠাকুর্দা মারা যাবার আগে যা বলে গেছিলেন, সে কথা ঠাকুরমার ডায়েরীতে পাওয়া যায়। তা তো হুবহু আমি আপনাকে বললাম। আমার মনে হয় আয়নায় তিনি বোধহয় ওই সুজাগড়ের জঙ্গলের ঘটনার দৃশ্যই আবার দেখতে পেয়েছিলেন। আর এর তো একটাই মানে হয়,তাঁর অতীত তাঁকে তাড়া করেছিল।

আবার চুপ করলেন বৃদ্ধা। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা ছিল না। শেষে পরমেশবাবুই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন বললেন না তো।

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কারণ একটাই, ওই আয়নায় ফ্রান্সিসের অভিশাপ লেগে আছে। তার জন্যই ওতে সবার অতীত পাপ ধরা পড়ে। এই পৃথিবীতে পাপী কে নয় বলুন? আমি চাই না অন্য আর কেউ ওই আয়নার জন্য বিপদে পড়ে। ওটা ভেঙে ফেলুন।

হাসেন পরমেশবাবু। বললেন, ম্যাডাম, আমার ব্যবসাই পুরনো জিনিস বেচাকেনা করা, যে সব জিনিসসের অমন চমৎকার অতীত, তা কিন্তু আমাদের ঘরে অনেক টাকা আনে। ওটা আমি ভাঙতে পারব না। তাছাড়া আমি নিজে ওটার সামনে বহুবার দাঁড়িয়েছি। আমার অতীত কিন্তু আমাকে একবারও তাড়া করেনি। বসুন, চা খান। তারপর ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছি, বাড়ি যান। মিছিমিছি আয়না নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।

বৃদ্ধা দুঃখই পেলেন। তাতে কিন্তু বিচলিত হলেন না পরমেশবাবু। বৃদ্ধা চলে যেতেই গাড়ি হাঁকিয়ে স্বয়ং রে জনসন হাজির হলেন। এক গাল হেসে বললেন, ওহে বোস, তোমার দেওয়া ভিষনু আমার ড্রইং রুমকে একেবারে থারটিন সেঞ্চুরিতে নিয়ে গিয়েছে। থ্যাঙ্কস্। আছে কিছু আর, চমকে দেবার মত?

আয়নাটার কথা বললেন পরমেশবাবু। সমস্ত গল্পই শোনালেন। শেষে বললেন, ওটা অবশ্য ঠিক আর্টের জিনিস হল না। তবে আমাদের ডাক্তার বিশীর ঘটনার পর ওটা নিয়ে আমিও ভাবছি। মনে হল তোমাকে বলি। তাই ...

রে জনসন পকেট থেকে চেক বই বের করে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করে দিলেন। ড্রাইভারকে ডেকে মালটা তখুনি তুলে নিয়ে যেতে বলে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। তবে সাহেব চলে যাবার আগেই চেকে টাকার অঙ্কটা পরমেশবাবু লিখিয়ে নিয়েছিলেন। অঙ্কটা ওঁরও আশাতীত।

আয়নাটা লরি চেপে চলে গেল। পরমেশবাবু ভাবলেন, বুধনকে জিজ্ঞেস করলে হয় না সে ঠিক কি দেখেছিল আয়নায়? বুধন, হলধর, মতি এরা তো সব নিকট আত্মীয়। হলধর, মতিই বা কি দেখেছিল আয়নায়? জিজ্ঞেস করি করি করেও আর জিজ্ঞেস করা হল না। ক'দিন পরে ইংরেজী কাগজে একটা ছোট্ট খবর নজরে পড়ল ওঁর। 'ভিয়েতনাম যুদ্ধের সম্মানিত বীর রে জনসনকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি আপন রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। ঘরে একটা বিশাল আয়নার ভাঙা কাচের মাঝে তাঁর মৃতদেহ পড়েছিল। আশপাশের সবাই বলেছে কদিন থেকে রাতে ওঁর ঘরে মাঝে-মধ্যে চিৎকার শোনা যেত। গতকাল গুলির শব্দ হওয়াতে পাড়া প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। সবার ধারণা ওঁর সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।'

খবর পড়ে পরমেশবাবু চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছিলেন। মতি ধরা পড়েছিল অনেক পরে। বাবরের মোহরটা ও বিক্রি করতে পারেনি। ওর আত্মীয় হলধর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ওটা উদ্ধার করে আনে।

পরমেশবাবু এখনও ভাবেন, তবে কি ডাক্তার বিশী তার চিকিৎসা বিভ্রাটে মৃত কোনও পেসেন্টকে সেদিন আয়নায় দেখতে পেয়েছিলেন? সত্যি যে কি তা আর ওঁর জানা হয়নি। কারণ ডাকলেও ডাক্তার আর ওঁর বাড়ীতে আসেন না আজকাল।

সত্যি ভূতের মিথ্যে গল্প

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সরাইকেলার জঙ্গলে একবার বাঘ শিকার করতে ঢুকেছিলাম। তা বাঘ ফাগ দূরের কথা একটা বেড়াল অবধি চোখে পড়ল না। মাঝখান থেকে কি হল জানিস?

ন'দাদু আমাদের দিকে একবার রহস্যময় চোখে একবার তাকালেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আয়েস করে পা ছড়িয়ে রেখেছিলেন, হাতে একটা গড়গড়ার নল।

আমরা ছেঁকে ধরলাম, কি, কি হয়েছিল দাদু?

আমরা বলতে আমি, পিকলু আর বুবু। দিন কয়েক হল আমাদের পরীক্ষা-ফরীক্ষা শেষ হয়েছে। বই খাতা সব শিকেয় তোলা হয়ে গেছে। সারাদিন টো টো কোম্পানি করে কাটে। সন্ধ্যের পর দাদুর কাছে হামলে পড়ি গল্প শুনতে। ন'দাদু আমাদের গল্পের খনি। কত গল্প যে ওঁর ঝুলিতে লুকনো আছে কে জানে।

—বল না দাদু, কি হয়েছিল?

আবার একবার গড়গড়ার নলে ধোঁয়া টেনে দাদু বললেন, ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে এক ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

— ভূতের পাল্লায়! মানে তুমি ভূত দেখেছ দাদু? আমরা আরও ঘন হয়ে বসি।

— দেখেছি কিরে! হা হা করে একগাল হাসলেন দাদু, রেগুলার বুদ্ধি খাটিয়ে ভূতকে কব্জা করে ফেলেছিলাম। বাছারা জীবনে আর আমার পেছনে লাগতে সাহস পাবে না।

ভূতের গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে। আমরা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলাম, বল না দাদু, কি হয়েছিল?

বুবু কেমন জবুথবু হয়ে এতক্ষণ বসেছিল। আমরা জানতাম, ভূতের ভয়ে ও সন্ধের পরে বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। বললাম, তুই বরং মামনির কাছে যা বুবু, আমরা গল্পটা শুনে নিই।

বুবুর বোধহয় পৌরুষে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কেন, তোরা যা না, আমি না শুনে যাব না।

— তুই তো শেষটায় ভয়ে মরবি।

বুবু কি বলতে যাচ্ছিল, দাদু হাসলেন, ভূতকে কখনও ভয় করতে নেই, ভয় করলেই ভূত আরও পেয়ে বসে। ঠিক আছে শোন, গল্পটা বলি।

আমরা দাদুকে প্রায় ছুঁয়ে বসলাম।

আরও একবার গড়গড়ায় তামাক টেনে দাদু শুরু করলেন, তখন আমার কতই বা বয়স। এই তিরিশ বত্রিশ হবে। বুঝলি, ভীষণ ডানপিটে ছিলাম। ঘুষি মেরে নারকেল ফাটাতে পারতাম। দাঁত দিয়ে লোহা চিবোতে পারতাম। তোদের দিদাকে জিজ্ঞেস করিস, জানতে পারবি।

জিজ্ঞেস করার কিছুই ছিল না, দাদুর এখন আশির মত বয়স, এই বয়সেও দাদু ভোর চারটেয় উঠে রোজ ফাঁকা মাঠে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। দাদুর সাহস আর শক্তি সম্পর্কে কোনদিনই আমাদের সন্দেহ ছিল না।

পিকলু বলল, ভূতে কি করল বল না দাদু! ভূতের গল্পটা আগে শুনে নিই।

— বলছি, বলছি অত হুড়োহুড়ি করলে চলে? আবার গড়গড়া টেনে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে দাদু শুরু করলেন, তা সে সময় রবার্টসন সাহেবের সঙ্গে আমাব খুব বন্ধুত্ব।

— কে রবার্টসন?

— এই দেখ, রবার্টসন সাহেবের নাম শুনিসনি! একেবারে কোড়া বিলিতি সাহেব রে! ইংরেজী ছাড়া কিছুই জানে না, কাঁটা চামচ ছাড়া খেতে পারে না। তার চলার ভঙ্গি দেখলে তোদের মাথা ঘুরে যেত। তা, সাহেবটা স্টুয়ার্ট কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এদেশে আসে। খুব আমুদে লোক। তেমনি মিশুকে। আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তোর দিদা একবার ওকে লাউ চিংড়ি আর মোচার ঘন্ট খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বিলেতে ফিরে গিয়েও সাহেব সে কথা ভুলতে পারেনি।

তা, সে কথা থাক। সাহেবের খুব শিকারের শখ ছিল। প্রায়ই বলত, কি, যাবে নাকি মুখার্জী?

— কোথায়?

— এবার সরাইকেলার জঙ্গলে যাব ঠিক করেছি। চল না, দুজনে একসঙ্গে

গিয়ে একটা বাঘ মেরে আনি।

শিকার টিকারে কোনদিনই আমার তেমন নেশা ছিল না। তাছাড়া জঙ্গলের নিরীহ পশুদের মারা আমি খুব পছন্দ করতাম না। কিন্তু সাহেবের আমন্ত্রণও ফেলতে পারি না। যদি না যাই, সাহেব ভাববে আমি ভীতু। ভয়েই যেতে চাইছি না। বললাম, ঠিক আছে চল।

তৈরী হয়ে নিতে কয়েক ঘন্টা সময়। পায়ে গামবুট পরলাম, মাথায় সাহেবের মত শোলার হ্যাট। পিঠে ছোট্ট একটা হ্যাভারশ্যাক। তাতে সামান্য কিছু ফার্স্ট এড, ছুরি, ব্রেড, দড়ি, রাত কাটাবার মত দু-একটা জামাকাপড়। তার সঙ্গে একটা দোনলা বন্দুক।

— তুমি বন্দুক চালাতে পার? বিস্ময় যেন আমাদের কাটতে চায় না।

দাদু মিটমিট করে একটু হাসলেন, বন্দুক চালান কোন কঠিন কাজ নাকি রে। বন্দুক তো যে কেউ চালাতে পারে। আসলে টারগেটের প্র্যাকটিস কার কত ভাল, তার ওপরেই সব নির্ভর করে। তা, আমার টিপ দেখে সাহেবের চোখও ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে কথা থাক, দুর্গ দুর্গা করে তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সরাইকেলার জঙ্গলে এসে সাহেবের সঙ্গে ঢুকেও পড়লাম।

তখনকার সেই সরাইকেলার জঙ্গলের তুলনা নেই। কত হাজার হাজার পাখি। জঙ্গলে ঢুকতেই দুটো বুনো শুয়োরকে দৌড়ে যেতে দেখা গেল। বুনো শুয়োরের জন্য গুলি খরচ করা উচিত নয়। আমি সাহেবের দিকে তাকালাম, সাহেব আঙুল নেড়ে বলল, যেতে দাও।

জঙ্গলের ভেতর কোন রাস্তা নেই। কাঁটা ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে কোন রকমে হাঁটতে হচ্ছিল। ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশ দেখা যায় না। গাছে গাছে আকাশটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘড়িতে তখন মাত্র বেলা বারোটা। কিন্তু সূর্যের আলোর হদিশ নেই। এ জঙ্গলে কোনদিন সূর্যের আলো ঢোকে বলে মনে হয় না।

সাহেব বলল, মুখার্জী, চল আমরা আরও একটু এগোই। আরও ভেতরে না ঢুকলে বাঘের হদিশ পাব না।

জঙ্গল এত ঘন যে একটু গা ছমছম করছিল ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে বন্দুক রয়েছে, যে কোন বিপদের জন্য তৈরী হয়েই রইলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম আমরা। গলা শুকিয়ে এসেছিল। ওয়াটার বটল খুলে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিলাম।

সাহেব বলল, চল মুখার্জী ওই টিবিটার ওপর বসে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

—প্রস্তাবটা খারাপ না। ঠিক আছে, চল।

দুজনে মাটির একটা টিবির ওপর হাত পা ছড়িয়ে একটু বসলাম, আর ঠিক এই সময় হাত পাঁচিশেক দূরে সরসর করে কেমন একটা শব্দ।

পিকলু হঠাৎ কথা বলে উঠল, কিসের শব্দ দাদু, ভূতের?

—ধুর বোকা। দিনের বেলা ভূত থাকে নাকি। দিনের বেলা ভূতেরা সব ঘুমিয়ে থাকে, রাত হলে ওরা জেগে ওঠে। ভূতেদের ব্যাপারটা মানুষদের ঠিক উল্টো।

তাহলে?

দাদু গড়গড়া টানতে গিয়ে বুঝলেন, আগুন নিভে গেছে। নলটা একপাশে সরিয়ে রেখে হাসলেন, কি হল তারপরে শোন না। শব্দটা একটু পরেই থেমে গেল।

আমরা ততক্ষণে বন্দুক তাক করে তৈরী হয়ে পড়েছি। ঝোপের দিক থেকে জন্তুটা বেরোলেই গুলি করব। কিন্তু জন্তুটার আর কোন সাড়া শব্দ নেই। কি জন্তু তাও বোঝার উপায় নেই। সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম।

সাহেবও কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না।

ফলে, অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় রইল না। খানিকক্ষণ ওইভাবে কেটে গেল, হঠাৎ আবার শব্দ। ঝোপটা আবার একটু নড়ে উঠল। আবার আমরা সতর্ক হয়ে বন্দুক তুললাম। কিন্তু না, আবার শব্দটা থেমে গেল।

বুবু একটু একটু করে আমাকে ঠেলে যেন মাঝখানে এসে বসার চেষ্টা করছিল। বললাম, কি রে ভয় লাগছে?

বুবু ফ্যাকাসে চোখে বলল, তোর ভয় লাগতে পারে, আমার নয়।

বটে। — পিকলু হেসে উঠল, ভীষণ বীরপুরুষ হয়ে গেলি যে।

দাদু বললেন, ভয়ের কি আছে। তারপর কি হল শোন। সাহেব এবার ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, মুখার্জী, এখান থেকে জন্তুটাকে ঠিক দেখা যাবে না। আমি ঘুরে ওপাশে যাচ্ছি। তুমি এখানেই পাহারা দাও। এদিক দিয়ে যদি কিছু ছুটে পালায় তুমি গুলি করবে।

সাহেব অভিজ্ঞ শিকারী। ওর কথা মেনে নেওয়াই ভাল। বললাম, ঠিক আছে।

আমি বসছি। তবে বেশী দূরে কিন্তু যেও না সাহেব, জঙ্গলে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে মুস্কিলে পড়তে হবে।

সাহেব আমাকে ভরসা দিয়ে গুটি গুটি পায় বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল। তারপর আমরা দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। সামনের ঝোপের দিকে বন্দুক তাক করে তৈরী হয়ে একা বসে আছি। আর কোন শব্দই নেই। এপাশ ওপাশ তাকালাম, সাহেবের টিকিটিও আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সেই ঝোপের ভেতর থেকে তিড়িং করে লাফ দিয়ে একটা হরিণ বেরিয়ে এসেই সাঁ সাঁ করে ছুটতে শুরু করল।

আর যায় কোথায়, বন্দুক গর্জে উঠল আমার। কিন্তু আঙুলটা বোধহয় একটু কেঁপে উঠেছিল, হরিণটা প্রাণে বেঁচে পালিয়ে গেল।

হরিণটা পালাতেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, রবার্টসন কোথায় তুমি, হরিণ হরিণ।

কিন্তু সাহেবের কোন সাড়া নেই। যাহ্ বাবা! কোথায় গেল লোকটা। কোন বিপদে পড়ল না তো?

আমি আবার চেঁচালাম, সাহেব, ও সাহেব। কোথায় তুমি?

এবারও উত্তর নেই।

ফলে বুঝতে পারছিস, আমার তখন কি অবস্থা। বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে সাহেবের যদি কিছু হয়, লজ্জার আর সীমা থাকবে না। আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম সাহেবকে। ঘড়িতে তখন সন্ধে হয় হয়। জঙ্গলের ভেতর তখন বেশ অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে।

আমি আরও কয়েকবার সাহেবের নাম ধরে চেঁচালাম, কিন্তু বৃথাই চেঁচান। বাঘেই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল না তো লোকটাকে? কি যে করি ভেবেই উঠতে পারছিলাম না। অথচ রাত হয়ে গেলে আমারও বিপদ হতে পারে। এখনই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী বস্তিগুলোতে গিয়ে খবর দেওয়া দরকার। লোকজন সঙ্গে এনে একবার না হয় ভাল করে খুঁজে দেখা যেতে পারে।

ফলে জঙ্গল থেকে বেরোবার জন্য এগোতে শুরু করলাম। কিন্তু তখন রাত্রির মত অন্ধকার চারপাশে, কিছুই দেখার উপায় নেই। ভেবেছিলাম দিনে দিনেই শিকার করে ফিরে যাব, তাই টর্চও আনিনি। কি ভুলই যে করেছিলাম তা বলার নয়।

জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। যেদিকে এগোই জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই। মহা দুশ্চিন্তাতেই পড়া গেল। একে এই রাত, তায় গভীর জঙ্গল। বাঘ এসে কখন যে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কে বলবে।

কিন্তু বিপদে কখনও ভেঙে পড়লে চলে না। মনে সাহস রেখে এগোতে শুরু করলাম। কতক্ষণ যে ওইভাবে কাটল বোঝার উপায় ছিল না। হঠাৎ এক সময় চমকে উঠলাম। জঙ্গলের ভেতরই বেশ দূরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে চোখে পড়ল। আলো যখন — নির্ঘাৎ ওখানে লোক আছে। মনে মনে বেশ ভরসা পেলাম। জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলাম আলোর দিকে।

বেশ খানিকটা এগিয়ে বোঝা গেল, জঙ্গলের ধারে একটা পোড়োবাড়ি মতন। ভাঙাচোরা। দেয়াল ফুঁড়ে গাছগাছালি গজিয়েছে। সেই বাড়ির সামনের দিকের একটা ঘরেই টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়িটার কাছে এগিয়ে এলাম। আর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে আমি অবাক। দেখি রবার্টসন সাহেব।

—কি ব্যাপার ? এখানে ? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

সাহেব কেমন অপরাধীর মত তাকাল। আর বলো না মুখার্জী, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এই পোড়োবাড়িটা চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে একটা মোম ছিল তাই জ্বালিয়ে নিয়েছি। এস, ভেতরে এস। ফাঁকা বাড়ি। রাতটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সত্যি ফাঁকা বাড়ি। ঘরের ভেতর প্রচুর ঝুল আর ময়লা জমে আছে। এখানে কেউ যে বাস করে না, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু ঘরের মাঝখানে একটা খাট পাতা রয়েছে। রাতটা ওখানেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ঘরে ঢুকে বন্দুকটা পাশে রেখে খাটে বসলাম। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা।

সাহেব বলল, বেশ অভিজ্ঞতা হল, তাই না!

—হ্যাঁ, তা তো হল সাহেব। কিন্তু এরকম পোড়োবাড়ি হচ্ছে ভূতেদের আস্তানা। রাতে আবার ঝামেলা না করে।

সাহেব হেসে উঠল, সঙ্গে বন্দুক আছে না। ভূত এগোতে সাহস পাবে না।

আমি মনে মনে হাসি। ভূত যদি খারাপ ধরণের হয়, তাহলে সাহেবের দৌড় দেখা যাবে।

যাই হোক, খাবার দাবার সঙ্গে কিছুই ছিল না। কি আর করি, ঢকঢক করে একটু জল খেয়ে খাটে গা এলিয়ে দিলাম। সাহেব মোমবাতির সামনে একটা বই

নিয়ে পড়তে বসল। ভালোয় ভালোয় রাতটা এখন কাটলে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল, হঠাৎ সাহেবের গোঙানীর শব্দ। কি হল? কি ব্যাপার? মোম নেভালে কেন?

খাট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ঘরের দরজা জানালাগুলো হা হা করছে খোলা। ওগুলো তো বন্ধ করেই রাখা হয়েছিল। তবে কি সাহেবই খুলে বাহাদুরি দেখাতে গিয়েছিল।

—ও সাহেব, কি হল তোমার?

দরজা জানালাগুলো খোলা বলে অল্প অল্প ভূতুড়ে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরে। সেই আলোতেই দেখা গেল, সাহেব মেঝেতে উবু হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

—ও সাহেব। সাহেবকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভারী লাশ কি টেনে তোলা সম্ভব।

—আহা, কি হয়েছে বলবে তো?

হঠাৎ মনে হল, পাশ থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠেছে। চমকে উঠলাম।

—কে? কে হাসে?

আবার হাসি।

—বটে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। যদি সাহস থাকে তো বল, কে তুই?

আবার হেসে উঠল সে। হাসতে হাসতেই বলল, কেঁ আঁমি দেঁখবি? এঁই দেঁখ।

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। দেখি একটা নরকঙ্কাল হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে।

সাহেবও হয়ত এই নরকঙ্কাল দেখেই ভিরমি খেয়েছে। কিন্তু আমি অত ঘাবড়ে যাওয়ার লোক নই। বললাম, চালাকি হচ্ছে না? ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিস?

—নাঁ গোঁ, আঁমি সঁত্যিকার ভূঁত।

—সত্যিকার ভূত! প্রমাণ দেখাতে পারিস?

—কিঁ প্রঁমাণ?

—ঠিক আছে একটা ছোট শিশি নিয়ে আয় দেখি। তুই যদি সত্যিকার ভূত হোস, তাহলে আমি যা করতে বলব তাই করে দেখা।

চোঁ করে একটা শিশি এসে আমার পায়ের কাছে পড়ল। শিশিটা তুলে নিয়ে তার ঢাকনা খুলে বললাম, এর মধ্যে যদি সূক্ষ্ম দেহ হয়ে ঢুকতে পারিস তাহলে বুঝব তুই ভূত।

—হুঁ, শিঁশির মঁধ্যে ঢুঁকি, আঁর অঁমনি তুঁই মুঁখ বন্ধ কঁরে আঁমায় আঁটকে রাঁখবি না। তোঁর চাঁলাকি আঁমি জাঁনি।

—ঢুকবি না? দাঁড়া, জোর করে তোকে আমি ঢোকাব।

যেই আমি শিশি হাতে কঙ্কালটার দিকে এগোলাম, অমনি সেই ভূত মাঁগো বাঁবাগো বলে দে ছুট। ভূত পালাবার সময় চোঁচাতে লাগল, ঢুঁকব না, ঢুঁকব না—

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ভূতের আর সাড়া নেই দেখে আমি মোমটাকে আবার জ্বালিয়ে নিলাম। সাহেবকে মেঝে থেকে টেনে খাটে তুলে শুইয়ে দিলাম। তারপর আবার দরজা জানালা বন্ধ করে সাহেবের পাশে বাকি রাতটা জেগে বসে কাটিয়ে দিলাম।

দাদু থামলেন।

বুবু জিজ্ঞেস করল, সত্যি গল্প?

সত্যি নয় তো মিথ্যে নাকি। দাদু মিষ্টি মিষ্টি করে একটু হাসলেন, ভূতের গল্প কখনও মিথ্যে হয় না রে বোকা। হা হা হা—

শব্দের রহস্য

বিমল কর

মানুষকে চমকে দিতে বনবিহারীর জুড়ি নেই। বনবিহারী আমাদের বন্ধু। সে পেশায় আর্কিটেক্ট। মানে নকশা করে ঘরবাড়ির। গণেশ অ্যাভিনিউতে তাদের একটা ফার্মও আছে, তবে বনবিহারী মাসের মধ্যে ক'দিন যে অফিসে গিয়ে বসে বলতে পারব না। বড়লোকের ছেলে, তিন পুরুষ ধরে টাকার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে পেটের চিন্তা নেই। নিজের শখ আর নেশা নিয়ে তার ব্যস্ততা বেশি। বনবিহারী ফটো তোলায় ওস্তাদ, দু'চারবার প্রাইজও পেয়েছে এখান ওখান থেকে। সে ড্রয়িংরুম ম্যাজিসিয়ান — মানে ছোটখাট আড্ডায় আসরে মজার মজার ম্যাজিক দেখাতে পারে। মাছ ধরার প্রচন্ড নেশা তার। তবে আমরা তার প্রতিভা দেখেছি গল্প বলায়। এমনটি আর দেখা যায় না। এমন গল্প বলবে যে চমকে যেতে হয়। তার গল্প বলার দোষ অনেক, গল্পের চেয়ে লেজুড় বেশি, এমন তরতরিয়ে গল্পের গরুকে গাছে উঁঠিয়ে দেবে যে কিছুই আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, তবু সব মিলিয়ে মিশিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা চমক সে দিতে পারে।

এই বনবিহারী সেদিন আমাদের আড্ডায় এল মুখে পাইপ গুঁজে। মাথায় দেখি নেপালী টুপি, বাঁ হাতে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা।

বনবিহারী মাস খানেক অদৃশ্য হয়েছিল। কলকাতার বাইরে যাবার কথা বলেছিল, কোথায় তা বলেনি।

বনবিহারীকে দেখে আমরা সবাই একসঙ্গে কী হয়েছে কী হয়েছে করছি তখন বনবিহারী মাথার টুপি খুলে দেখাল তিন তিনটে জায়গায় চুল নেই বললেই চলে। মানে জখমের ব্যাপার কিছু হয়েছিল। জায়গাগুলো কামিয়ে সেলাই পড়েছিল। এখন আবার খোঁচা খোঁচা চুল গজাচ্ছে।

"তোর কী হয়েছিল?"

বনবিহারী বলল, "বলছি। তার আগে চা খাওয়া। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।"

নিখিল গিয়ে চায়ের কথা বলে এল বাড়ির মধ্যে।

"তোর হাতে কী হয়েছে?" ফণী জিজ্ঞেস করল।

"হাত মাথা সব একই ব্যাপার। অ্যায়সা অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলাম ভাই, জীবনটাই চলে যেত। কী করে যে বেঁচে গেলাম — আজও বুঝতে পারি না।"

"অ্যাকসিডেন্ট?"

"হ্যাঁ। সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট। দাঁড়া বলছি" — পাইপের পোড়া ছাই পরিষ্কার করতে করতে বনবিহারী বলল, "একটু দাঁড়া, গলাটা ভিজিয়ে নিতে দে।"

চা এল খানিকটা পরে। যে যার মনের মতন চায়ের কাপ তুলে নিলাম। আমরা পাঁচ জন বনবিহারী, নিখিল, ফণী, যতীন আর আমি।

চা খেতে খেতে বনবিহারী বলল, "তোদের তো বলে গেলাম ক'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। আমার যাবার কথা ছিল ওয়ালটেয়ার। ছোট পিসেমশাই একটা পুরনো বাড়ি কিনবেন। বলেছিলেন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িটা দেখাবেন। তা কিসের এক ফ্যাচাংয়ে পিসেমশাইয়ের ওয়ালটেয়ারে যাওয়া হল না, তার বদলে আমার এক ভগ্নীপতি, মাসতুতো বোনের স্বামী, পল্লব আমায় ধরল, বলল — চলুন চলুন, নাগাল্যান্ডে ঘুরে আসবেন। হপ্তাখানেকের ব্যাপার।

পল্লব এমন একটা বিদঘুটে কাজ করে যার মাথা মুন্ডু আমি বুঝি না। তার কাজের বারো আনাই মিলিটারি সিক্রেটের মতন ব্যাপার। যেন যা কিছু হবে সবই গোপনে, বাকি চার আনা থেকে যা জানতে পারলাম — তাতে মনে হল, পল্লবকে একটা বাজে কাজেই পাঠানো হয়েছে।

এই কাজটা কী তা বলার আগে সামান্য ভূমিকা দরকার। ভূমিকা হিসেবে এইমাত্র বলতে পারি, আজকের দুনিয়ায় অনেক আজগুবি কান্ড ঘটছে। কারা ঘটাচ্ছে সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। যাদের টাকা আছে রাশি রাশি তাদের আর যাদের মাথায় গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীব সম্পর্কে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে ওরা না করছে এমন কিছু নেই। সোজা কথা, টাকাঅলা এবং মাথাওয়ালা কিছু লোকের একটা ক্লাব আছে যার নাম এখানে বলা যাবে না। এই সংস্থা কিন্তু আন্তর্জাতিক। দেদার টাকা। খয়রাতির টাকাতেই ধনী। হেড অফিস—মানে সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে। এই ক্লাবের কাজ হল আমাদের জগতের বাইরে থেকে ভেসে

আসা সাঙ্কেতিক শব্দকে ধরবার চেষ্টা করা এবং তার অর্থ উদ্ধার করা। কথা হল, কেউ যদি মনে করে আমাদের জগতে এমন শব্দ নিয়মিত আসছে তবেই না সে চৌকিদারী করতে লোক বসাবে। ওরা তা মনে করে। পল্লব এই ক্লাবের একজন কর্মচারী। ভারতের পূর্বাঞ্চলে তার কাজ। কাজকর্মের হুকুমটা আসে দেরাদুনের কাছাকাছি তাদের ভারতীয় দপ্তর থেকে। পল্লব একজন রেডিও কমিউনিকেশনের এক্সপার্ট, চাকরিটা একরকম নতুনই।

আমরা যে নাগাল্যান্ডের এক সর্বনেশে এলাকায় গিয়ে পড়লাম তার কারণটা হল ওই সাঙ্কেতিক যোগাযোগ উদ্ধারের আশায়। পল্লবদের সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল, অমুক জায়গায় অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত কোনো সাঙ্কেতিক শব্দ শোনা যেতে পারে। পল্লব যেন হাজির থাকে সেখানে।

পল্লব আমায় টেনে নিয়ে গেল কেন আমি জানি না। আমার মনে হয়, একা একা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে আর পোকার কামড় খেতে তার ভাল লাগবে না বলেই — সঙ্গী হিসেবে সে আমায় ধরে নিয়ে গেল। তা ছাড়া দাবা। পল্লব দাবা খেলায় পাকা। আমারও ও ব্যাপারে নেশা আছে। দাবা খেলে সময় কাটানোর মতলবও পল্লবের ছিল।

আমরা যে জায়গায় ছিলাম তার নাম বলা নিষেধ। ধরো জায়গাটার নাম আকলা। পাহাড়ের এক বিশাল ঢাল নেমেছে পূবের দিকে, তারই গা ধরে ঘন বনজঙ্গল, পাহাড়ী এক নদী। ওই নির্জনে থাকার ব্যবস্থা কিন্তু ভালোই। একটা ডাকবাংলো ধরণের বাড়ি, কাঠের। বাড়ির আধখানা থাকা-টাকার জন্য, বাকিটা অফিস। ওখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজোড়া চাপরাশি কাম ড্রাইভারের কথা বলতে হয়। জিপ ছিল একটা। আর ছিল ছোকরা নেপালী এক রেডিও এঞ্জিনীয়ার। সে সাধারণ কাজকর্ম বেশ চালাতে পারত। ডাকবাংলো থেকে গজ পঞ্চাশ দূরে ছিল এক টাওয়ার, রেডিও কমিউনিকেশনের জন্যে।

আমরা ওই জায়গায় পৌঁছেছিলাম এক বুধবার। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দিব্যি কেটেছে। মানে ভাত, মুরগির ঝোল, আলুর দম, সেঁকা রুটি, জেলি এইসব খেয়ে। কফি আর চা খেয়েছি ঘন্টায় ঘন্টায়। জিপে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বলব না কারণ ওই জিনিসটি করার উপায় ছিল না। পল্লবকে অনবরত নজর রাখতে হচ্ছিল কোনো সাড়াশব্দ এসে পৌঁছোয় কি না।

তোমরা হয়তো বলবে, সাড়া শব্দ পাওয়া যেতে পারে এই খবরটা কে দেয়?

আগেই বলেছি খবরটা মূল অফিস থেকে বিভিন্ন এলাকায় ঘাঁটি অফিসে যায়, সেখান থেকে আসে জোনাল অফিসে। যেমন পল্লবের কাছে খবর এসেছিল দেরাদুনের অফিস মারফত।

আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই মানে, টাকার শ্রাদ্ধ বলে মনে হচ্ছিল। নিতান্ত পাগলামী। কোথাও কিছু নেই কোথাকার এক আকলার অফিসের রেডিও ঘরে অন্য জগতের খবর এসে পৌঁছবে। সাঙ্কেতিক শব্দে। গ্রহান্তরে কেউ আছে কি না— তারই যখন ঠিক নেই তখন শব্দটা পাঠাবে কে? কেনই বা পাঠাবে।

আমাদের সাত দিন থাকার কথা। বুধ থেকে শুক্রবার দিব্যি কাটিয়ে শনিবার বিকেলের দিকে বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ নেপালী ছোকরা পল্লবকে ডাকল, স্যার —শিগ্রী আসুন।

ডাক পেয়ে পল্লব চলে গেল রেডিও ঘরে। আমি বসে থাকলাম। চা শেষ হল, দু দুটো কড়া সিগারেট শেষ হল — পল্লব আর আসে না। তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছি — ওদের রেডিও ঘরে আমার যাওয়া বারণ ছিল। জোর করলে যেতে পারতুম, কিন্তু আমার জোর করতে ইচ্ছে করেনি।

এক ঘন্টারও পরে পল্লব ফিরে এল। বলল, "একটা গোলমালে পড়ে গেলাম বনবিহারী দা। একটা শব্দ তো ধরা যাচ্ছে। যাকে বলে বিপ বিপ শব্দ। বড় ছোট ছোট বড় আবার বড়। এই শব্দটা কিসের তা তো বুঝতে পারছি না।"

আমি বললাম, "কোন প্লেনের আওয়াজ হবে।"

পল্লব মাথা নাড়ল, না।

ঘন্টা খানেক পরে আবার উঠল পল্লব। আমি ঘরে চলে গেলাম।

সন্ধে হয়ে গেল। রাত হল। পল্লব আর আসে না। প্রায় ঘন্টা তিনেক পর পল্লব এল। এসে বলল, "বনবিহারী দা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সেই শব্দটা আরও স্পষ্ট আরও জোরে হয়েছে। পাক্কা পনেরো মিনিট অন্তর আট মিনিট করে সিগন্যাল দিচ্ছে। শর্ট লং আর মানছে না। কিন্তু কে দিচ্ছে তা তো ধরতে পারছি না।"

পল্লব এক মগ কফি, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আবার চলে গেল অফিসে। আমি একা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় — পল্লব আর আসে না। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো। আমারই বা একা একা ভাল লাগবে কেন।

পল্লব ফিরে এল বেশ রাত করে। বলল, "বনবিহারী দা কোনো একটা ব্যাপার হয়েছে। কী হয়েছে আমি বলতে পারব না, তবে সেই সিগন্যালিং আরও তাড়াতাড়ি হচ্ছে। পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর। মনে হচ্ছে যেন, কোনো অপারেটর কিছু বলার চেষ্টা করছে। বিপদে পড়ল নাকি তাই বা কে জানে। তাছাড়া বিপদে পড়ার মতন জিনিসটাই বা কী? কোনো ফ্লায়িং অবজেক্ট না, এই শব্দ অন্য কিছুর। যাই হোক, তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো, আমার কপালে রাত জাগা রয়েছে। হয় শব্দটা থামা পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে, না হয় ওর যতক্ষণ বিপ বিপ আমারও ততক্ষণ রেকর্ডিং চলবে।"

আমি বললাম, "ওই একই শব্দ রেকর্ড করে কী হবে?" পল্লব বলল, "তা জানি না। আমরা রেকর্ডিংয়ের টেপ সদর দপ্তরে জমা দি। সেখানে ওরা অর্থ পরীক্ষা করে। একবার এক ফ্লায়িং অবজেক্টের সিগন্যাল ধরা পড়েছিল। আমি অবশ্য শুনেছি।"

পল্লব চলে গেল তার দপ্তরে। সেই নেপালী ছোকরাটি তখন থেকে এক ঠায় বসে আছে সেখানে। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

তোমরা বিশ্বাস করবে না ভাই, এরপর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। তখন কত রাত তা আমি জানি না — অঘোর ঘুমে তখন, আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে মনে হল যেন এক অন্ধকার গুহার মধ্যে পড়ে আছি। চোখ চেয়েও কোনো কিছু বুঝতে পারছি না, দেখতে পারছি না। অন্ধ হলে হয়ত এই রকমই দেখায় সব। কোনো শব্দও পাচ্ছিলাম না।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি, বা কিছু একটা ঘটে গেছে ভেবে যেন বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। তারপর যখন ধীরে ধীরে নিজের চেতনাকে ফিরে পেলাম, মনে হল— আমি বিছানায় শুয়ে নেই, মাটিতে পড়ে আছি। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না, শব্দ নেই। হুঁশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। এরকম তো হবার কথা নয়। ডাক বাংলোর বাইরে বাতি জ্বলে। সাধারণ বাতি। রেডিও ঘরের জন্যে ওদের ব্যাটারি আর কী যেন সব আছে। এমন নিকষ কালো অন্ধকার তো হবার কথা নয়।

সঙ্গে আমার টর্চ ছিল। কিন্তু ওই অন্ধকারে কোথা থেকে টর্চ খুঁজে নেব? কোথায় আমার বিছানা? পড়ে আছি মাটিতে। পল্লবের কী হল? কী হল নেপালী ছেলেটির? দুই চৌকিদারের?

অন্ধকার হাতড়েও না খুঁজে পাই নিজের খাট, না দরজা। অন্ধের মতন হাতড়ে

বেড়াচ্ছি — হঠাৎ শুনি অদ্ভুত এক শব্দ বিপ্ বিপ্ বিপ্ বিপ্। কোনো শব্দই নিজের কানে না শুনলে তা অনুভব করা যায় না, বিশেষ শব্দটা যখন অপরিচিত। তোমরা ইংরেজী সিনেমায় এই ধরণের একটা শব্দ শুনেছ হয়তো। কিন্তু আমি যে শব্দের কথা বলছি তার কাছাকাছি কোনো শব্দ আমি অন্তত জীবনে শুনিনি। অদ্ভুত এক শব্দ — বিপ্ বিপ্ বিপ্ বিপ্ একটানা। কোথাও ছেদ নেই। বিরতি নেই। মনে হল শব্দটা খানিকটা তফাৎ থেকে আসছে।

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এই শব্দটা এতক্ষণ কোথায় ছিল? শুনতে পাইনি কেন? নাকি যে সময়টুকুতে আমার হুঁশ ছিল না সেই সময়টুকু আমি নিজেই শুনতে পাইনি।

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। একেবারে আচমকা। কেন থামল বুঝলাম না। পল্লবদের জন্যে আমার তখন ভীষণ ভয় হচ্ছে। কোথায় তারা?

কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে, গুঁতো খেতে খেতে ঘরের বাইরে এলাম। সেই নিকষ কালো অন্ধকার, আকাশের তারার আলোও যেন মেঘে আড়াল পড়ে আছে, ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছিল, শন শন বাতাসের শব্দের সঙ্গে কেমন এক ভয়ও যেন ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে।

আমি চিৎকার করে পল্লবের নাম ধরে ডাকলুম, ডাকলুম নেপালী ছেলেটিকে, চৌকিদারদের। কোন সাড়া শব্দ নেই। আতঙ্কে উদ্বেগে পাগল হয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলাম ওদের। না, কোন সাড়া নেই।

ঠিক এই সময় হঠাৎ আবার সেই শব্দ — বিপ্ বিপ্ বিপ্ বিপ্। এবার আর অত ধীরে নয়। জোরে। শব্দটা একই রকম, তবে তার জোর বাড়ছে। মনে হল, আগে যা তফাতে ছিল, এখন তা কাছে এসে গেছে অনেকটা।

কোন শব্দ তা যেমনই হোক, যদি একই নাগাড়ে একইভাবে তোমার কানের কাছে বাজে কেমন হয় শুনেছ কখনো? আমিও আগে শুনিনি। গান বলো, বাজনা বলো, বৃষ্টির শব্দ বলো, রেলগাড়ির শব্দ বলো — সব শব্দেরই উঁচু নিচু পরদা আছে। কখনও জোরে কখনও ধীরে হয়, ছন্দে ভাঙচুর আছে, ওঠা নামার খেলা আছে। কিন্তু একইভাবে, সমানে একই ধরণের কোন শব্দ বাজতে থাকলে যে কী ভয়ঙ্কর লাগে তোমরা বুঝবে না। একদিন পরীক্ষা করে দেখ। পাগল হয়ে যাবে।

আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। শব্দটা আর থামছে না, থামছে না। সেই একইভাবে বিপ্ বিপ্ বিপ্ বিপ্। আর প্রতি মুহূর্তে তার জোর বাড়ছে।

কী হয়েছে তাহলে? রেডিও ঘরের দরজা জানলা কী ভেঙে গেছে, না

খোলা? পল্লবরা কী অজ্ঞান হয়ে আছে? নয়তো এই শব্দ কেমন করে আসবে!

আমি কিছুই না বুঝে ঠাওর করতে না পেরে শুধু শব্দটার দিকে কান রেখে অন্ধকারে এগিয়ে চললাম পা পা করে।

যেতে যেতে মনে হল শব্দটাই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন অদ্ভুত এক নেশার আকর্ষনে ওই শব্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শব্দটা ক্রমশ জোর হচ্ছিল। কিন্তু তার সুর বা ছন্দ পাল্টাচ্ছিল না। বিপ্ বিপ্ বিপ্।

শেষ পর্যন্ত আমি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম যেখান থেকে আর পিছিয়ে আসা যায় না, এগিয়ে যাওয়াও নয়। সেই জগতটা শুধু ওই শব্দের। একই রকম শব্দের। আর কী প্রচন্ডভাবে সেই শব্দ আমার কানের ওপর বাজতে লাগল, আমাকে পাগল, বেহুঁশ করে তুলল তোমাদের বলতে পারব না।

হ্যাঁ, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল।

আমরা সকলেই বেঁচে, তবে জখম হয়েছি কম বেশি। আমার মাথার তিন চারটে জায়গায় কাঁচ বা কাঠ লেগে কেটে গেছে। রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। পল্লবের ডান হাত ভেঙেছে, নেপালী ছেলেটির পা জখম। চৌকিদারদের চোট জখম কম।

হয়েছিল কী?

রাত দুটো নাগাদ এক ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পই বলতে হবে — কেননা তামাম জায়গাটা দুলতে শুরু করে, কাঠের বাড়ির দরজা জানলা ভেঙে পড়ে। পল্লবেরা তখনই চোট পায়। তারা রেডিও ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজা-টরজা ভেঙে পড়ে। ওরা চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আর শব্দটাও তখন বেশ জোর হয়ে উঠেছিল।

সকালে পল্লব আর নেপালী ছেলেটি মিলে যেটুকু দেখল বুঝল — তাতে মনে হল, রেডিও ঘরের যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু ওই বিপ্ বিপ শব্দটাই তখনও বেজে চলেছে। তবে তার সেই শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল যেন — মিলিয়ে আসছে।

রনবিহারী থামল। পাইপে তামাক ঠাসল। ধরালো ধীরে সুস্থে। তারপর বলল "এই শব্দটাকে কী মনে হয় তোমাদের?"

আমরা চুপ করে থাকলাম।

যতীন বলল, "ভুতুড়ে।"

"হতে পারে," বনবিহারী বলল, "তবে আমার মনে হয়, এটা কোন বাইরের ব্যাপার নয়, মানে কোন গ্রহান্তরের জীব এ শব্দ পাঠাচ্ছে না। কেন পাঠাচ্ছে না — তার যুক্তি হল — মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি অভ্যেস মতন এক ধরণের সাঙ্কেতিক শব্দ কমিউনিকেশনের জন্যে — মানে খবরাখবর দেওয়া নেওয়ার জন্যে ঠিক করে নিয়েছে। তার মূল ধরণটা এক। অন্য গ্রহের জীব আমাদের শব্দ নকল করবে কেন? তারা তাদের মতন শব্দই পাঠাবে। সেটা কেমন হবে আমরা জানি না। হয়ত মেঘের ডাকের মতন, হয়ত নাচার শব্দের মতন, হয়ত বৃষ্টির মতন। আমরা জানি না। কাজেই ওই শব্দটা এই জগতের। তবে হ্যাঁ, যেভাবে শব্দটা সেদিন ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আমার মনে হয়, ওটি ভাই শব্দভেদী বাণ।"

"শব্দভেদী বাণ?"

"রামায়ণ পড়নি। রাজা দশরথ অন্ধমুনির ছেলেকে ভুল করে মেরেছিল, ভেবেছিল হরিণ জল খাচ্ছে।"

"তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?"

"সম্পর্ক সরাসরি কিছু নেই। তুলনাটাও ঠিক নয়। তবু আমি বলব, আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মারার যে মহড়া চলছে লুকিয়ে লুকিয়ে, নানারকম গোপন ও ভয়াবহ অস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে, কাগজে প্রায়ই দেখো, এই অস্ত্রটি তার অন্যতম। শব্দ দিয়ে মানুষ মারার ফন্দি। ... আমার মনে হয় পল্লবদের ক্লাব সন্দেহ করেছিল কেউ এ রকম কিছু একটা করতে পারে। নজর রাখতে বলেছিল। দুঃখের বিষয় নজর রাখতে গিয়ে আমরাই ঘায়েল হয়ে গেলাম।"

পুরনো জিনিস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মদনবাবুর একটাই নেশা, পুরনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তাঁর টাকারও অভাব নেই, বিয়ে-টিয়ে করেননি বলে এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরনো রাঁধুনী বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট ঝামেলা নেই, কোথাও পুরনো জিনিস, কিম্ভূত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোঁছ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি, ইঁদুর, আরশোলা, উইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট-পালং, ডেস্ক, টেবিল চেয়ার, দোয়াতদানী, নস্যির ডিবে, কলম, ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তাঁর সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে বাড়িটা আজও টিকে আছে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনদের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল, কারণ জন ম্যাকফারলনেরও

পুরনো জিনিষ কেনার বাতিক। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তাঁর জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালী ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, উটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।

মদনবাবু তাঁর বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, ওরে ভজা, আমি চললুম, দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেলে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।

ভজা মাথা নেড়ে বলে, নতুন নয় পুরনো।

ওই হল। আর রাঁধুনীকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরী হতে পারে।

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যাকফারলনের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড় হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশির ভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তাঁর কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনও জিনিসে হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর ওঘর ঘুরে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

বেলা বরোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগিনির পালঙ্ক দশ হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এক ছড়া মুক্তোমালার দাম উঠলো চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বড্ড বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষ দিকে একটা পুরনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়সড় এবং সাদামাটা আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কব্জা করার জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

একটা বুড়ো হাঁকল বিশ হাজার।

মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই নয়। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি? নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

নয়। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি? নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু নিয়ে না যেতে পারলে নিজের কাছেই যে নিজে মুখ দেখাতে পারবে না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, একুশ হাজার।

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তর দিকে জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারী জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু। নিচে ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডব। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা, বর্মা সেগুন কাঠের তৈরী ভাল জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তা আর কী করা। এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে মাঝে ঠকতেই হয়। একুশ হাজার টাকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীর রাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন, বুড়ো তাঁকে বলছে, তুমি মোটেই ঠকোনি হে বরং জিতেছ।

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, না না আমার তা মনে হয় না ... আমার তা মনে হয় না ...

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজও ঘুম ভাঙলো। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, দয়া করে বাতি জ্বালবে না, আমার অসুবিধে হবে।

মদনবাবু ভারি রেগে গেলেন, টর্চের সুইচ টিপে বললেন, আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে। কে হে তুমি?

চোরটা যে কে বা কেমন তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর ঝাঁকালেন, নাড়ালেন, উল্টে পাল্টে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি।

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে তাঁর গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন। হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, শিগগীর বেরও বলছি, নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলবার আছে।

— নেই।

— কে বলল নেই?

— জানি কিনা।

— কিন্তু লাঠি আছে।

— খুঁজে পাবেন না।

— কে বলল খুঁজে পাব না?

— অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কি সোজা?

— আমার গায়ে কিন্তু সাঙঘাতিক জোর, এক ঘুঁষিতে নারকোল ফাটাতে পারি।

— কোনদিন ফাটাননি।

— কে বলল ফাটাইনি?

— জানি কিনা। আপনার গায়ে তেমন জোরই নেই।

— আমি লোক ডাকি, দাঁড়াও।

— কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?

— চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এ ঘরে, আর এই ঘরেই কিনা চোর।

— চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।

— তার মানে?

— কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। দুরু দুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাটগ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক হলঘরে গিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দু'জন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কি দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে খুশি খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম হল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে একটু তন্দ্রা মত এল। হঠাৎ হলঘরে আগের রাতের মতো শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে ঢুকে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

— কে?

— তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন।

মদনবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তোমরা কারা বাবারা?

— সে কথা শুনলে আপনি ভয় খাবেন।

— হুঁয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা, এসব কী হচ্ছে একটু জানতে পারি না?

— খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।

— তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পড়ি। তোমরা কি চোর?

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, কাল থেকে চোর চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।

— তবে?

— আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা চামুণ্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।

— আলমারি?

— আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক না কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই—

— তাই কি?

—তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।

মদনবাবু বেশ খুশীই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, কিন্তু বাবারা, দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।

মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক ফিচিক করে হাসতে লাগলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা তিনতলায় যা ফাঁকা আছে তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

ভাড়া বাড়ি

মঞ্জিল সেন

অনেকদিন পর কলকাতায় বদলি হয়ে এসে বাড়ির সমস্যায় পড়লাম। মণিকার কোন বাড়িই পছন্দ হয় না, ওকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এতদিন কানপুরে খোলামেলা বাংলো ধরণের কোয়ার্টার, বাগান, এমনকি চাকরদের জন্যে পর্যন্ত আলাদা থাকার ব্যবস্থা, এসবের পর এখানকার ঘিঞ্জি এলাকায় ক্ষুদে ক্ষুদে ঘরে ওর মন ওঠার কথা নয়। আমি যখন অফিসে থাকি তখন ও বাড়ি দেখে বেড়ায়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ছাড়াও জনাকয়েক বাড়ির দালালও ইতিমধ্যে জুটেছে। এসব বিষয়ে ওর অদম্য উৎসাহ।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মণিকা প্রায় ছুটেই আমার সামনে এল। ওর দু'চোখ উজ্জ্বল, উত্তেজনায় ফর্সা মুখ লালচে দেখাচ্ছে।

জান, আজ একটা দারুণ বাড়ি দেখেছি, ভাড়াও ভীষণ কম, খুশিতে ও যেন ডগমগ করছে।

আমি একটু কৌতুহলী হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম।

বাড়িটা হচ্ছে পার্কসার্কাসে, একটু নিরিবিলিও আছে। একতলায় দুটো বেডরুম আর একটা ড্রইং রুম। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বেশ বড় বড়। দোতলায় তিনটে বেড রুম, একটা বাথরুম, চওড়া বারান্দা। ভাড়া মোটে আড়াইশ টাকা। মণিকা বিজয়ীনির মত তার কথা শেষ করল।

আমি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই কোন জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছ। একটা দোতলা পুরো বাড়ি আড়াইশ টাকা ভাড়া! ফুঃ।

তুমি তো অমন কথা বলবেই, একটুও গতর নাড়াবে না, বাড়িতে বসে বসে শুধু বাক্যি ছাড়বে। মণিকা বেশ উষ্মাভরেই বলল।

আমি গৃহশান্তির আশায় তাড়াতাড়ি বললাম, আহা, আমার কথাটা আগে শোন। আজকাল কতরকম মানুষ ঠকানো ফিকির বেরিয়েছে তা তো জান না। হয়তো বাড়ি ভাড়া নেবার পর জানা গেল যাকে বাড়িওয়ালা জেনে সরল বিশ্বাসে টাকা-পয়সা দিয়েছি সে একজন ভন্ড। জাল বাড়িওয়ালা সেজে আমাদের ঠকিয়েছে।

অত কাঁচা মেয়ে আমাকে পাওনি, মণিকা আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বাড়ির দলিল আমি দেখে এসেছি।

এরপর আমার আর কথা থাকতে পারে না। বাড়িটা যখন এত ভাল, ভাড়াও নামমাত্র, তবে খালি পড়ে আছে কেন এ প্রশ্ন করার মত সাহস আমার হল না।

পরদিন রবিবার ছিল। মণিকা আমাকে নিয়ে বেরুল, বাড়িটা দেখাবে আর সেই সঙ্গে বাড়িওয়ালার সঙ্গে পাকা কথা বলে আসবে।

বাড়িটা দেখে আমি কিন্তু সত্যিই হাঁ হয়ে গেলাম। পুরনো বাড়ি সন্দেহ নেই, জায়গাটাও নির্জন, কিন্তু একটু রঙ-চঙ করে দিলে আজকালকার বাজারে বেশ মোটা টাকা ভাড়া সহজেই পাওয়া যায়। বাড়িওয়ালা থাকেন গড়িয়াহাট রোডে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে একটা ভুল ভাঙলো। বাড়িটা আসলে এক নিঃসন্তান বিধবা ভদ্রমহিলার। মণিকা যাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল তিনি হলেন ভদ্রমহিলার ভাইপো। আজ ভদ্রমহিলার সঙ্গেই কথাবার্তা হল। আমরা বাড়িটা নেব শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন চুনকাম করিয়ে দেবেন। ভাড়া মাসে ওই আড়াইশ টাকা আর এক মাসের ভাড়া আগাম।

একটা ভাল দিন দেখে আমরা পার্কসার্কাসের বাড়িতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠলাম। আমরা অর্থে আমি আর মণিকা ছাড়া আমাদের পাঁচ বছরের মেয়ে খুকু আর ছোকরা চাকর রাম।

সেট ছিল একটা ছুটির দিন। আমি সন্ধ্যেবেলা একখানা মোটা বই নিয়ে আয়েস করে বসেছি। মণিকা খুকুকে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়াচ্ছি, এমন সময় নজরে পড়ল সামনের টেবিলের ওপর দেশলাইটা রয়েছে। আগে ওটা ওখানে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। মনের ভুল ভেবে আমি হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিলাম।

খানিক বাদেই মণিকা ফিরে এল। ওর মুখে একটা উত্তেজনা লক্ষ্য না করে পারলাম না। আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ও বলল, বাড়িটা এত সস্তায়

ভাড়া পেয়েছি কেন জান?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চোখ তুললাম।

এটা ভুতুড়ে বাড়ি। আগে যারা ভাড়া নিয়েছিল কেউই এক মাস দূরের কথা, পনের দিন পর্যন্ত টিকতে পারেনি। অনেকদিন খালি পড়েছিল, তাই ভাড়া এত সস্তা। দেখলে না, আমরা বাড়িটা নেব শুনে ভদ্রমহিলার আনন্দ যেন আর ধরছিল না।

আমি অবিশ্বাস ভরে ঠোঁট বাঁকালাম। মণিকা কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলল, ওই মোড়ের মাথায় যে হলদে বাড়িটা, সেই বাড়ির ভদ্রমহিলার সঙ্গে আজ আলাপ হল। ওঁরা এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা। ওঁর মুখেই শুনলাম বেশ কয়েক বছর আগে এই বাড়িটা ছিল বাসুদেব রায়চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর আমাদের খুকুর মত পাঁচ বছরের একটি মেয়ে নিয়ে ছিল তাঁদের সংসার। মেয়েটি নাকি তার মা-বাবার খুব আদরের ছিল। আর অত ছোট হলে কি হবে, খুব গিন্নি ছিল। একদিন দোতলা থেকে নামবার সময় পা পিছলে ও সরাসরি একতলায় পড়ে যায়। সেই যে জ্ঞান হারিয়েছিল আর জ্ঞান ফেরেনি। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই মারা যায়। এই ঘটনায় স্বামী স্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়েন। কিছুদিন পরে তাঁরা বাড়ি বিক্রি করে কাউকে না জানিয়ে কোথায় যে চলে গিয়েছেন, কেউ আর তাঁদের খবর জানে না। বাড়িটা কিনেছিলেন আমাদের বাড়িউলির স্বামী। তাঁদের ছেলেপুলে ছিল না। কিছুদিন যাবার পরই বাড়িতে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যাতে তাঁরা ঘাবড়ে গেলেন। তাঁদের চোখের সামনে থেকেই নাকি জিনিসপত্র শূন্যে ভেসে উধাও হয়ে যেত, যেন অদৃশ্য কেউ সেগুলি হাতে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকেই ভাড়া দেবার চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু কেউই বেশীদিন টিকতে পারেনি।

অর্থাৎ পাঁচ বছরের মেয়ে ভূত? আমি একটু বিদ্রূপ করেই বললাম।

মনিকা কিন্তু আমার বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। ও যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। হঠাৎ ও বলে উঠল, মেয়েটির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। ও বোধহয় এখনও এই বাড়িতে তার মা-বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার কোনদিনই কৌতূহল কিংবা বিশ্বাস ছিল না। একটু পরিহাসতরল কণ্ঠে আমি বললাম, মেয়েটি সম্বন্ধে যা শুনেছ তাতে মনে হয় ভাল মেয়ে ছিল, তবে সে আগে যারা ভাড়াটে এসেছিল তাদের ওপর দৌরাত্ম্য করত

কেন?

হয়তো তাদের তার পছন্দ হয়নি, মণিকা চিন্তিত কণ্ঠে বলল। কয়েক মুহূর্ত পরে ও আবার বলে উঠল, আমরা যদি ওকে শান্তি দিতে পারি, তবে বোধহয় ও কিছু করবে না। খুকুর জন্যই আমার একটু ভাবনা, ওরই তো সমবয়সী ছিল। ছোটরা আবার অনেক কিছু অনুভব করে, যা আমরা বড়রা ঠিক বুঝতে পারি না।

আমি আর মণিকার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় যোগ দিলাম না, কিন্তু হঠাৎ দেশলাইয়ের কথাটা আমার মনে পড়ল। এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে ওটা আগে টেবিলের ওপর ছিল না। আমার মন কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল।

পরদিন রাত্রে আরও একটা ঘটনা ঘটল। মণিকা প্রায় হুড়মুড় করে ঢুকে বলল, জান, এইমাত্র একটা কান্ড হল।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ না দিয়েই ও বলে চলল, আমি রান্না করছিলাম, উনুন থেকে কড়াটা নামাব বলে সাঁড়াশি খুঁজছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ওটা বাড়িয়ে দিল। আমি ভাবলাম বোধহয় রাম। পরে পেছন ফিরে দেখি কেউ নেই। আমার কেমন একটু সন্দেহ হল। রামকে ডাকলাম, ও ভাঁড়ার ঘরে রুটি বেলছিল। আমার প্রশ্ন শুনে অবাক, রান্নাঘরে ও নাকি আসেই নি।

আমি এবার সত্যিই একটু চিন্তায় পড়লাম। বললাম, খুকু দুষ্টুমি করে সাঁড়াশি দিয়ে পালিয়ে যায় নি তো?

না; ও হাতের লেখা লিখছে। তাছাড়া আমি যে মনে মনে সাঁড়াশিই খুঁজছিলাম তা ও জানবে কেমন করে?

কথাটা সত্যি ভাববার মত। আমি চুপ করে রইলাম। মণিকা আবার বলে উঠল, একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ও আমাদের কোন ক্ষতি করতে চায় না, বরং সাহায্যই করতে চায়। তোমাকে আগে বলি নি, অনেক সময় খুঁটিনাটি জিনিস দরকার মত আমি হাতের কাছে পেয়ে গেছি, যেন ঠিক কোন সময় কোন্ জিনিসটা লাগবে বুঝে কেউ তা আমার হাতের নাগালের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আশ্চর্য!

আমি কিন্তু সহজে এ বাড়ি ছাড়ছি না, মণিকা বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলে উঠল, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমরা এ বাড়িতে আসায় ও মোটেই অসুখী হয়নি, বরং ওর আত্মা তৃপ্ত হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

একটু থেমে মণিকা আবার বলল, জান, ও বোধহয় আমার মধ্যে ওর মাকে খুঁজে পেয়েছে। কত সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমার পায়ে পায়ে কেউ হাঁটছে, খুকু মনে করে আমি ফিরে তাকিয়েছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেছে, তেমন উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটেনি এর মধ্যে। সেদিন অফিস যাবার সময় পোশাক পরে টেবিলের ওপর থেকে পার্সটা নিতে গিয়ে সেটা দেখতে পেলাম না। তাড়াহুড়োয় কোথায় রাখলাম ভেবে পকেট হাতড়াচ্ছি, টেবিলের ড্রয়ার খুলে সব উল্টেপাল্টে দেখছি এমন সময় মনে হল যেন পাশেই কচি মেয়ে খুক করে হাসল। খুকুর দুষ্টুমি ভেবে ফিরে চাইলাম, কিন্তু কেউ নেই তো। আবার ঘুরে দাঁড়ালাম, হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম। পার্সটা টেবিলের ওপরে হাতের কাছেই রয়েছে। ও কি আমার সঙ্গে খেলা করছিল। বাপ মায়ের আদরের মেয়েরা অনেক সময় যেমন দুষ্টুমি দুষ্টুমি খেলা করে।

আরেকদিন সন্ধ্যের পর আমি, মণিকা আর খুকু ওপরে আমাদের শোবার ঘরে বসেছি, কিন্তু কেন জানি পড়তে ভাল লাগছে না। শীত পড়েছে বলে দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আমার স্পষ্ট মনে হল যেন ছোট্ট কেউ পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল, তারপরই আবার দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। মণিকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর দু'চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। খুকু কিন্তু একমনে পড়ে যাচ্ছে, ও কিছু টের পায়নি। অনুভূতি, ছাড়া আর কিছু নয়, কচি কচি পায়ে কেউ যেন এগিয়ে আসছে। মণিকাও যেন সেটা অনুভব করছে। আস্তে আস্তে ও বাঁদিকে ঘাড় ফেরাল, যেন ওর পাশে কেউ বসেছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মণিকার সুন্দর বড় বড় দু'চোখে একটা অপূর্ব কমনীয় ভাব ফুটে উঠেছে, ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি মৃদু হাসি।

খুকুর কথায় আমাদের দুজনেরই চমক ভাঙল। বলল, মা, আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে।

খানিক বাদেই মণিকাকে উঠতে হল, ওর রান্না পড়ে আছে। আমি স্পষ্ট দেখলাম ওঠবার সময় ও বাঁদিকে ফিরে অনুচ্চকণ্ঠে যেন বলল, এস।

মাঝে মাঝে বেশ মজার ব্যাপারও ঘটত। একদিন একতলায় বসবার ঘরে

আমি সোফায় হেলান দিয়ে সেন্টার টেবিলের ওর দু'পা তুলে দিয়েছি, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার ডান পায়ের পাতায় কেউ যেন কচি নরম আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিল। আমি চমকে উঠতেই কচি মেয়ের একটা চাপা হাসি যেন মিলিয়ে গেল।

আর একদিন মণিকা খুকুকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়েছে, ফিরতে রাত হবে। আমি একটা বইয়ে ডুবে আছি, হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা কচি মেয়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধ স্পষ্ট নাকে এসে লাগল।

মণিকা একদিন দোকানে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, জান, কি হয়েছে? আমি দোকান থেকে হাফ পাউন্ড বিস্কুট কিনে দোকানদারকে টাকা দিয়েছি, দোকানদার চেঞ্জ দিয়ে একটা টফি হাতে করে আমার মাথার উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, খুকি এই নাও তোমার টফি। তারপরই একটু অবাক হয়ে বলল, এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল? আমিও কম অবাক হইনি, বললাম, কার কথা বলছেন? দোকানদার বলল, কেন, আপনার সঙ্গে যে ছোট মেয়েটি এসেছিল। আপনি দোকানে ঢুকলেন ও বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখতে বলুন তো? দোকানদার কিন্তু চেহারার ঠিক বর্ণনা দিতে পারল না, অত ভাল করে লক্ষ্য করেনি। আমার সঙ্গে কেউ আসেনি শুনে লোকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, তবে হয়তো অন্য কারও মেয়ে।

একটু থেমে মণিকা আবার বলে উঠল, ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

কিন্তু চূড়ান্ত ঘটনা ঘটল এক শনিবার। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি। সবাই মণিকার এক দিদির বাড়ি যাব, রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরব। আমি জামা-কাপড় পরে একতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি, মণিকাও সাজগোজ সেরে দোতলায় সিঁড়িতে পা দেবে, খুকু ওর পাশ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল, হঠাৎ ওর পা হড়কে গেল। মণিকা একটা আর্তনাদ করে উঠল, আমিও নিচে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পারছি যে খুকু পড়ে যাচ্ছে, একটা সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে, কিন্তু আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে স্পষ্ট দেখলাম, দুটো কচি হাত খুকুকে ধরে ফেলল, তারপর সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। মুহূর্তকাল মাত্র, তারপরই হাত দুটো মিলিয়ে গেল। একটা সর্বনাশ হতে হতে থেমে গেল। মণিকা তরতর করে ছুটে এসে খুকুকে জড়িয়ে ধরল। খুকু কিন্তু ঠিক কে যে ওকে ধরেছিল তা বুঝতে পারেনি,

ওর মুখে শুধু একটা ফ্যাকাসে হাসি ফুটে উঠল।

এরপরই আমি আর মণিকা আলোচনায় বসলাম। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু বিবেচনা করে আমাদের স্থির করতে হবে আমরা এ বাড়িতে থাকব কি থাকব না।

মণিকা বলল, দেখ, আমি যা বুঝেছি, ও আমাদের মধ্যে ওর হারানো পরিবেশ ফিরে পেয়েছে। ও শুধু আমাদের ভালই চায় না, এটাও চায় যে আমরা এখানে থাকি, তা না হলে খুকুকে অমন করে বাঁচাত না। আরও একটা জিনিস যা আমার মনে হয়, তা হল আগে যাঁরা ভাড়াটে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হয়তো মনোমত পরিবেশ পায়নি বলেই ও বিরক্তি প্রকাশ করত, তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক এটাই চাইত। আমরা স্বামী, স্ত্রী আর খুকু, — ওদের পরিবারও তাই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ওদের সংসারের পরিবেশটা আমাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে বলেই ও খুশি। আমি নিজে মা হয়ে অমন একটা কচি মেয়ের সুখ আনন্দকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। আমরা এ বাড়িতেই থাকব, তোমার কোন আপত্তিই কিন্তু আমি শুনব না।

মণিকার কথা শেষ হতেই আমার স্পষ্ট মনে হল যেন একটি কচি মেয়ে মিষ্টি করে হাসল।

জ্যোৎস্নায় ঘোড়ার ছবি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ির সামনে পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে কিছুটা গেলে, আম-লিচুর বাগান। ও দিকটায় দত্তদের বাড়ি এবং আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে ছাড়াবাড়ি। পাশে খাল — বড় বড় সব গাব গাছ। গাব গাছের পাতা লম্বা কালো রঙের — গাছের গুড়ির রঙও কালো। ডালপালার মধ্যে গভীর অন্ধকার। ছেলেবেলায় রাতে কোন গাব গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না। গা ভয়ে শিরশির করত।

গাঁয়ের বাড়ি যেমন হয়ে থাকে — ছাড় ছাড়া। বাড়িঘর কম। সবার বাড়িঘরের সঙ্গেই বাগান পুকুর বাগিচা থাকে। গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ স্বচ্ছল।

পুকুর বাগান নিয়ে এক একটা বাড়ি একা দাঁড়িয়ে থাকে। খেলার মাঠ থেকে ফিরে যে যার বাড়িতে দৌড়ে ঢুকে যেতাম। কারণ সন্ধ্যার পর অপদেবতারা এখানে সেখানে থাকবেই। রাত হলে তাদের খুব মজা।

আর যেমন সব এলাকরই একটা শ্মশান থাকে, আমাদের এলাকার শ্মশানও নদীর পাড়ে। ক্রোশখানেক দূরে ছাগল-বামনি নদীর ধারে। খুবই নির্জন জায়গা। মাঠ পার হয়ে আলিপুরার বাজার পার হয়ে শ্মশানে যেতে হয়। তবে সেটা শরতে, শীতে এবং গ্রীষ্মে। বর্ষাকাল এলে নদীর পাড় জলে ডুবে যায়। বর্ষায় কেউ মারা গেলে, যে যার পুকুরের পাড়ে অথবা বাগানে মৃতের দাহ করে।

ফলে যা হয়, যে কোন বাগান কিংবা পুকুরের পাড় রাতে আমাদের ভীতির সঞ্চার করত। রাতের বেলা একা বের হতে সাহস পেতাম না।

অন্ধকার না থাকলে নির্জন বাগ বাগিচা না থাকলে ভূতেরা আস্তানা খুঁজে পায় না। দিনের বেলায় কেউ কখনও ভূত দেখেছে শুনিনি। ভূত দেখতে হলে রাতে

দেখতে হয়। সাদা জ্যোৎস্নায়ও ভূত দেখা যায়। সাদা জ্যোৎস্নায় ভূতেরা আমাদের খেলার মাঠে ফুটবলও খেলে শুনেছি। এসব কথা অবশ্য বলা ছেলেবেলার সেই সব অলৌকিক দেব দেবী এবং ভূত প্রেতের বিশ্বাস কত গভীর ছিল তাই বোঝাতে। কলকাতায় ভূত থাকে না। অনেক শহর থেকেই তারা আস্তানা গুটিয়ে পালিয়েছে। আমি এখন কলকাতার মানুষ বলে, প্রায় ভূতের উপদ্রবের কথা ভুলেই গেছি। তবে আমি যে ভূত দেখি না তা নয়। ঘোরে পড়ে দেখি। এটা একটা অসুখও হতে পারে। সে যাই হোক সেদিন মঞ্জু আবার আমার জানালায় হাজির হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেল।

সেই যে বললাম, গাব গাছের অন্ধকার, বড় ভয় লাগে রাতে — মঞ্জু এসেই বলেছিল, কী ছেলেমানুষী করেছি তোকে নিয়ে। এখন ভাবলে নিজেরই হাসি পায়।

মঞ্জু আমার সমবয়সী। ওর বাবা কবিরাজ। ওদের একটা লাল রঙের ঘোড়া ছিল। মঞ্জুর বাবা হেমন্তে, শীতে ঘোড়ায় চড়ে রুগীর বাড়ি যেতেন। ডাকসাইটে কবিরাজ। লাল ইটের দালান — সামনে সবুজ ঘাসের লন, পরে এক লপ্তে বিঘে দশেক জমি নিয়ে নানা বয়সের গাছ-গাছালি। কবিরাজীতে এ সব গাছ গাছড়া বড় দরকার। চন্দনগোটার গাছগুলি ছিল বড় লম্বা। আমি মঞ্জু দুপুরে পালিয়ে চন্দনগোটা সংগ্রহ করেছি কত। কমলা রঙের ঠিক যেন এক একটা ছোট বৃত্তাকার পলা। আংটির পাথরের মত। চন্দনগোটার বন পার হলেই গাব গাছের জঙ্গল। নদীনালার দেশে গাব গাছের বড় দরকার। গাবের কস না খাওয়ালে বর্ষায় নৌকো ভাসানো যায় না। কবিরাজী ওষুধে গাবের ডালপালা লাগে কিনা জানি না, তবু ঐসব গাছগুলি মঞ্জুর বাবা অমর কবিরাজ বড় যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করতেন। তার নিচে লাল রঙের ঘোড়াটা যখন যেত তখন মঞ্জু আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম। মঞ্জু সব সময় কেন যে সাদা ফ্রক পরতে ভালবাসত জানি না। ওকে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না।

সেই মঞ্জুর মা এক সকালে কেন যেন জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল, এখনও তার কারণ আমরা জানি না। বর্ষাকাল বলে মঞ্জুর মাকে দাহ করা হয়েছিল ছাড়াবাড়ির পাশে খালের ধারে। জমিজমা বাগ বাগিচা গাঁয়ে অমর কবিরাজেরই বেশি। মঞ্জুর দাদুও ছিলেন বড় কবিরাজ। ওদের বংশটাই কবিরাজের বংশ। সৌখিন মানুষ গাঁয়ে এমনিতেই কম দেখা যায়। মঞ্জুদের বাড়ি গেলে আমরা বুঝতে পারতাম সৌখিনতা কাকে বলে। সাদা টাইলসের মেঝে, বাতিদান,

মোমবাতি সেখানে জ্বালানো হত। রাতে কাচের জারে মোমবাতি জ্বালালে কেমন এক মায়াবী আলোর জগৎ তৈরী হয়। মঞ্জুদের বাড়ি না গেলে আমরা বুঝতেই পারতাম না, মানুষ এত সৌখিনতায় বড় হতে পারে। বসার ঘরটা ছিল হলঘরের মত। মঞ্জুর বাবা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, হাইস্কুলের সেক্রেটারী, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। এসব দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, এমন সুন্দর বাড়িতে কেউ কখনও আত্মহত্যা করতে পারে।

এখন বুঝি আত্মহত্যার পর মৃতের ময়না তদন্ত হয়। তখন এসব জানতাম না। সে সময় নিশ্চয় এমন সব আইনের কড়াকড়ি ছিল না। অথবা এও হতে পারে প্রভাবশালী মানুষের বউ আত্মহত্যা করলে ময়না তদন্তের রেয়াজ নেই। আত্মহত্যা না খুন এটা ঠিক হয়নি তখন। লাশ তোলার পর, গলায় কলসী বাঁধা দেখা গেছেঃ এই পর্যন্ত। গাঁয়ের সব মানুষজনকে দেখেছি মঞ্জুর বাবাকেই প্রবোধ দিতে। কেন মরল এটা বড় কথা নয়, মরে যে ঠিক করেনি, এত বড় একটা বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে, এমনই ছিল তাদের অভিযোগ।

যাই হোক, মঞ্জুর মা কীরকম রূপবতী ছিল লিখে তার প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মঞ্জু খুবই ভেঙে পড়েছিল। মঞ্জুর জন্য আমার খুব কষ্ট হত। আমাদের পুকুর পার হয়ে আমবাগানের ভেতর দিয়ে গেলে মঞ্জুদের বাড়ি। আমার বাবা কাকাদের সঙ্গে খুবই সুসম্পর্ক। আমার মা কাকীরা সারাদিন তাদের বাড়িতেই ছিলেন। দাহকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়েননি। মঞ্জুকে সামলাবার দায় ছিল আমার।

আর আশ্চর্য, মঞ্জুর মায়ের আত্মহত্যার পরদিন ঘোড়াটাও জলে ডুবে মরে থাকল। ঘোড়াটার চারটে পা বেঁধে কারা ঘোড়াটাকে জলে ফেলে দিয়েছে। ঘোড়াটার খুব কাছের জন ছাড়া পায়ে দড়ি কেউ বাঁধতে পারে, আমার কেন কারোরই বিশ্বাস হয়নি। কাছের জন বলতে, ঘোড়াটার দেখভাল করে ইমতাজ আলি, ঘোড়াটায় চড়ে মঞ্জুর বাবা। বর্ষাকালে অবশ্য ঘোড়াটা ছাড়াবাড়িতে ঘাস খেত। কারণ বর্ষাকালে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাওয়া যায় না। সেসময় ঘোড়াটার আরও কাছে ছিল মঞ্জু নিজে। মঞ্জুর সে বড় অনুগত ছিল। মঞ্জু খুশি মত ঘোড়ার পিঠে আমাকে নিয়ে ছাড়াবাড়িতে নির্জন দুপুরে ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা তখন বাড়ি থাকত না। নৌকো করে মাস দু-মাসের জন্য দূর দেশে চলে যেত রুগীপত্তর দেখতে। বছরকার ওষুধ সঙ্গে নিত। আবার পরের বর্ষায় দেখা হবে, বছরকার ওষুধপত্তর দিয়ে মঞ্জুর বাবার ফিরতে মাস দুই লেগে যেত। নৌকোয় রান্না হত—

মাঝিমাল্লার সঙ্গে রান্নারও লোক থাকত।

বর্ষার মাস দুই তিন বাবা না থাকায় মঞ্জুদের বাড়িতে কোনো কড়া নিয়মকানুন থাকত না। যখন তখন মঞ্জু আমাদের বাড়ি চলে আসত। রঙ্গন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলত, এই যাবি।

তখন সে আর আমি, আর লাল রঙের ঘোড়া। ছাড়াবাড়িটা বিশাল — গাছপালা আর গভীর জঙ্গল, ঘাসের মাঠ। কুলের দিনে কুল, পেয়ারার সময় গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে দেওয়া, গোলাপজাম, যখনকার যা, সবই সংগ্রহ করতে হত আমাকে। গাছের নিচে মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকত। গাছের ডালে আমি। সুতরাং দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জনমাবারই কথা। সুখে-দুঃখে মঞ্জুর আমি সঙ্গী। ওর মা মরে গেল, ঘোড়াটা মরে গেল, এক সকালে শোনা গেল ইমতাজ আলিও নেই। সেও খালপাড়ে মরে পড়ে আছে। এক মাসের মধ্যে মঞ্জুদের বাড়িটা কেমন খালি হয়ে গেল। আমি ছাড়া মঞ্জুর তখন আর কোনো অবলম্বনই ছিল না। সে সারাটা দিন আমাদের বাড়িতে থাকত। কিছুতেই বাড়ি যেতে চাইত না। মঞ্জুকে কেউ নিতে এলে মা কাকীমারা বলত, থাক না। এখানে থাকলে মনটা ওর ভাল থাকে ...।

সে থাকত। আমরা একই ঘরে শুতাম। মঞ্জু শুতো ঠাকুমার সঙ্গে। ঠাকুমার এক পাশে মঞ্জু, এক পাশে আমি।

সেই মঞ্জু যে বড় হয়েও আমাকে ভুলতে পারেনি, এটা এখন টের পাই। মঞ্জু প্রায়ই জানালায় এসে দাঁড়ায়। বলে কিরে মনে আছে?

কী মনে আছে।

রাতে তুই আমি দরজা খুলে বের হয়ে যেতাম। জ্যোৎস্না রাতে ছাড়াবাড়ির মাঠে শুনতে পেতাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

এগুলো এক ধরণের রহস্যময়তা, এই বয়সে তাই মনে হয়। অথবা ঘোরে পড়ে গেলে হয়। আমরা বোধহয় দুজনেই ঘোরে পড়ে বের হয়ে যেতাম। দেখতাম, দূরে জ্যোৎস্নায় কে দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জু বলত, আমার মা। আমাকে দেখতে আসে।

আমি কিছু দেখতে পেতাম না। তা জ্যোৎস্নায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে। মঞ্জু এমন সরলভাবে কথাটা বলত যে বিশ্বাস না করে পারতাম না। আমারও কেন জানি মনে হত সত্যিই শাড়ি পরে কেউ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা এভাবে একেক রাতে একেক দৃশ্য দেখতে পেতাম। কখনও মঞ্জুর মাকে, কখনও লাল রঙের ঘোড়াটাকে, কখনও ইমতাজ আলিকে, আবার কখনও

তিন জনকেই একসঙ্গে। ইমতাজ আলি মঞ্জুর মাকে নিয়ে ঘোড়াটায় চড়ে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যেত।

এখন অবশ্য আমার বয়েস হয়েছে। দেশভাগের পর মঞ্জুকে আর দেখিওনি।

তবু নাকি আমার কী হয় মাঝে মাঝে। একদিন তো আমার স্ত্রী কেঁদেই ফেলেছিল — তোমার কী হয়। কার সঙ্গে একা একা কথা বল।

কার সঙ্গে বলি কী করে। মঞ্জু আমার জানালায় সাদা জ্যোৎস্নায় এসে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যাবেই। স্ত্রীর এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমার নাকি এটা একটা রোগ। একা একা আমার নাকি কথা বলার অভ্যাস।

কার সঙ্গে বলি সে কিছুতেই জানতে পারেনি।

আসলে নিভৃতে থাকলেই, মঞ্জু আর আমি সেই জ্যোৎস্নার মাঠে চলে যাই। যেখানে আমরা এক রূপকথার জগৎ রেখে চলে এসেছি। মঞ্জুর মা, লাল রঙের ঘোড়া, ইমতাজ আলি সেই রূপকথার মানুষ হয়ে গেছে। মঞ্জু মাঝে মাঝে বলে, আমরা কি ছেলেমানুষ ছিলাম, না।

এসব কারণে মঞ্জু কোথায় আছে জানার আমার কোন আগ্রহ জন্মাত না। একবার শুনেছিলাম, মঞ্জুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মুক্তি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনারা নাকি তাকে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবে মঞ্জু যেখানেই থাক, মাঝে মাঝে আমার জানালায় আসবেই।

কখনও কোন রাতে দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনতে পাই। আমি দরজা খুলে বাইরে চলে আসি। বাড়ির সামনে বিশাল মাঠ। ঘাসের ওপর সাদা জ্যোৎস্না, আমি দাঁড়িয়ে থাকি। মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্জুর ঐ এক কথা — দেখতে পাচ্ছিস। আমার মা। আমাদের লাল রঙের ঘোড়া। ইমতাজ আলি ঘোড়াটার জন্য ঘাস কাটছে। ঘোর কেটে গেলে ফিরে আসি। স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে জানে আমি ফিরবই। আসলে মানুষ রহস্যময় পৃথিবীতে সব সময় বেঁচে থাকতে চায়। আমিও তাই আছি। জানি না, এ সত্যি ঘোরে পড়ে দেখি, না তারা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দূরাতীত গ্রহ থেকে দেখা করার জন্য নেমে আসে। ঠিক বেঠিক বুঝি না।

শাঁখারিটোলার সেই বাড়িটা

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

আমি বা আমরা, মানে, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে আমরা সাত ভাই, ভাইপো ভাইঝিরা আর দু-তিনটি ভাগ্নে-ভাগ্নী। মিলেমিশে থাকতাম সবাই। হুই-হুল্লোড়-পড়াশোনা-গল্পগুজব-খেলাধূলা সবকিছু নিয়ে দিব্যি মেতে থাকতাম।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি। ক্রমে বৃষ্টিটা জাঁকিয়ে এল।

সারপেন্টাইল লেনের এখনকার চেহারার সঙ্গে ষাট বছর আগের চেহারার খুব একটা ফারাক দেখি নে। 'সারপেন্ট' মানে, সাপের মতই এঁকে বেঁকে এই গলিপথটা কখন যে কোনদিক থেকে কোনমুখো বেঁকে গিয়েছে, দশ নম্বর বাড়িটার পর তেইশ নম্বর বাড়িটা যে কোনখানে, কোনদিকে — তার হদিশও পাড়ার পাকাপোক্ত বাসিন্দা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। এর উপর এদিকের 'নেবুতলা' — শশীভূষণ দে স্ট্রীট-এর চেহারা মানেই আম-জাম-কাঁঠাল আর সুপারি-নারকেল মিলে এক জঙ্গুলে চেহারা। চোর ডাকাতের ভয় যত না, সাপ খোপ পোকা মাকড়ের ভয়ে ওই বিস্তীর্ণ এলাকাটা সন্ধ্যের আগে থেকেই কেমন 'ভয় ভয়' চেহারা নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকত। তার মধ্যে ভরসন্ধ্যেয় অমন বৃষ্টি।

কিন্তু মুষলধারে ঐ বৃষ্টির মধ্যে, তখনও আমাদের গল্প-গুজবের শেষ হয়নি— দুম্-দুম্ শব্দে সদর দরজায় জোর ধাক্কা। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে রাত আটটা বাজল। স্বাভাবিকভাবেই আমরা চমকে উঠলাম। আমাদের বাচ্চাকাল থেকেই বড্ড ভূতের ভয়। নড়লাম না। নদা আমাদের মধ্যে বেশ মোটাসোটা জোয়ান জোয়ান চেহারা। তিনিই গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা দাদা কাকা বড় সবাই, তাঁরা যে যার ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁরা তখনও জানেন না ঐ বৃষ্টিতে কেউ একজন সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে নদা দরজাটা

খুলে দিয়েই দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোক তাঁর গায়ের ওয়াটার প্রুফটা ভিজে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা অমন অঝোর ধারায় বৃষ্টির মধ্যেও নেভেনি -- এটা কেমন করে সম্ভব হল? পায়ের জুতো-টুতো ভিজে জবজবে। মাথায় একটা সাবেকি ধরণের ফেল্ট ক্যাপ। ভদ্রলোক বললেন, তোমার কাকা-টাকাকে বল নিরঞ্জন বাবু এসেছেন।

ভদ্রলোক যে আমাদের পরিচিত, সেটা তাঁর কথায় বোঝা গেল। আমাদের বাবা যে মারা গেছেন, নেই, এটা না জানলে নিরঞ্জনবাবু কাকার কথাই বা বলবেন কেন?

ভদ্রলোক, মানে নিরঞ্জনবাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নদা গিয়ে বড় কাকাকে খবর দিলেন। বড় কাকা বেশ ভারিক্কি মানুষ। কত্তা-কত্তা ভাব। রাশভারি চেহারা। কম কথা বলেন, কিন্তু কথাগুলো সবই দরকারী। তবে নিরঞ্জনবাবু নামটা শুনেই সেই বড় কাকা কিছু ব্যস্তসমস্ত হয়েই দোতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। কী ব্যাপার। আমরা তখন একটা নতুন কিছু ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছি। একেবারে চুপচাপ সবাই। বড় কাকা দরজার এপার থেকেই হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জনবাবুর হাত ধরলেন। বললেন, আরে নিরঞ্জনদা তুমি! একবারে ভিজে গেছ। এসো এসো ভিতরে এসো।

বড় কাকার পিছন পিছন তখন বাড়ির বড়রা অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন। কিছু সুস্থ হয়ে বসলেন নিরঞ্জনবাবু। ভিজে জামাপ্যান্ট খুলেছেন। ওয়াটার প্রুফটা, জুতো জোড়াও। আমাদের বাড়ির কারো পাজামা পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে দিব্যি ভদ্র হয়েছেন এবার বড় কাকা-কাকীমাদের কৌতূহল মেটাতে, আমাদের সবাই এর উৎসুক মুখগুলোর দিকে চেয়ে গড়গড় করে বলে গেলেন — তোমরা সবাই আমাকে দেখে, বিশেষ করে, বৃষ্টির ভিতর এই রাতে, হতভম্ভ হয়ে গেছ, তাই না? হ্যাঁ, হতভম্ব হবারই কথা। নইলে কোথায় ডেনমার্ক — সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার আর কোথায় এই কলকাতার একটা এঁদো গলি সারপেন্টাইন লেন—

আকাশ ভাঙা বর্ষা বাদলের মধ্যে ঝিমঝিম করা প্রায় অন্ধকার রাতে কথাগুলো চট করে বলে ফেললেন সেজদা। আসলে সেজদাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু। ভীষণ ভূতের ভয় তার। ব্যাপারটার মধ্যে সেজদা ইতিমধ্যেই একটা 'ভূত ভূত' গন্ধ পেয়ে গেছেন বুঝি। কাকীমা আর বড়বৌদির গা ঘেসে বসেই কথাগুলো বললেন।

সেজদার দিকে কেমন ড্যাবড্যাব করে, বড় বড় চোখে চেয়ে দেখলেন বড় কাকার নিরঞ্জনদা। বললেন, হঠাৎই আসতে বাধ্য হলাম। মধ্য কলকাতায় একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল আমার বরাবরই। কারণ মধ্য কলকাতাটাকেই আমরা

আসল কলকাতা বলে জানি। আমার এক এদেশীয় বন্ধু এ ব্যাপারে আমাকে ডেনমার্কে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল — মধ্য কলকাতার শাঁখারিটোলায় নাকি একটা দোতলা বাড়ি অনেক বছর ধরে খালি পড়ে আছে। অনেকগুলো ঘর, কল বাথরুম রান্নাঘর বারান্দা এবং ছাদ। সব মিলে দারুণ পছন্দসই বাড়ি। আমি যদি অবিলম্বে এসে বায়নাপত্তর করি, কেনার ব্যবস্থা করি, ভাল হয়। তা, আমি ভাবলাম, মানে, চট করে তোমাদের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম তোমরা কাছে থাকবে — ভালই হবে।

তাই, তড়িঘড়ি পরশুর ফ্লাইটেই চলে এলাম। এসে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম। আমার যে বন্ধু খবরটা লিখেছিল তাঁকে চিনতেন বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। তিনি আমাকে অবাক করে বললেন, হরিহর সামন্ত, মানে আমার ঐ বন্ধু ভদ্রলোক ২৭শে জুন ট্রামে কাটা পড়েন এবং মারা যান। আমি বিস্মিত হলাম, হরিহরবাবুর লেখা চিঠিতে তারিখটা দেওয়া ছিল তিন জুলাই। মানে, বাড়িওয়ালার কথানুযায়ী বন্ধু ভদ্রলোক নিজের মৃত্যুর ছদিন পর চিঠিটা লিখেছিলেন। এ কেমন করে সম্ভব?

গোঁজামিলের নিয়মে একটা কিছু ভেবে নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিলাম। এ্যাডভান্স হিসাবে পাঁচ হাজার টাকাও দিলাম বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে। তারপর মনে হল তোমাদের পাড়াতে আসাই যখন, শুভ সংবাদটা তোমাদের জানিয়ে যাই। তা আসি আসি করে এমন সময় রওনা দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। কী বৃষ্টি! ভিজে নেয়ে একেবারে জ্যাবজেবে হয়ে গেলাম। ভাগ্যিস পায়জামাটা দিলে —

বড় কাকা-কাকীমারা খাওয়ার কথা বললেন, নিরঞ্জনবাবু রাজী হলেন না। বললেন, গৃহপ্রবেশের দিন তোমাদের নিয়ে যাব, এখন যাই।

উঠে পড়লেন নিরঞ্জনবাবু। সেজদা বললেন, আপনার কোটপ্যান্ট এসব কি করে নেবেন?

জুলজুল চোখে ভদ্রলোক সেজদার দিকে চেয়ে বললেন, কী বলতে চাও তুমি? আমার ঠিকানা দিয়ে গেলাম। এতগুলো ছেলে আছ। সামান্য পোশাকটাও কাল-টাল দিয়ে আসতে পারবে না?

যেন ভীষণ রেগে গেছেন নিরঞ্জনবাবু। মেজাজী কথাবার্তায় জুলুম জুলুম ভাব। আরও অবাক যেটা — সেজদা ছেলেটাকে উনি যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। গট গট করে চলে গেলেন। বলে গেলেন, শীগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, মঙ্গলবার।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর বাড়ির সবাই খাওয়া দাওয়ার পাট সেরে একে

একে যে যার মত শুয়ে পড়লাম। রাত দশটা বেজে গেছে। আমার ঘুম এল না, নানা কথা ভাবতে লাগলাম।

শাঁখারীটোলার সেই অভিশপ্ত বাড়িটি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। সেখানেই আজ রাত কাটাবেন নিরঞ্জনবাবু। বাড়িটার একটা বদনাম আছে। অনেকে বলে ভুতুড়ে বাড়ি। নিশিরাত্রের দুই প্রহরে কি করছেন তিনি কে জানে? কেমন আছেন তাই বা কে জানে?

একটা 'বল হরি হরি বোল' চীৎকার শোনা গেল। ঐ বৃষ্টিতে কার ঘরে কী সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝি।

রাত তখন দুটো। 'বল হরি' শব্দটায় কাঁটা দিয়ে উঠল সারা শরীরে। কে জানে এরপর কোন সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ...

এক সময় অনেক বেলায় ঘুমটা ভেঙে গেল। উঠেই শুনি একটা চাপা গুঞ্জন বাড়ির সবার মুখে। কী হল।

শোনা গেল, ভোর ভোর রাতে সেই ভিজে কোটপ্যান্টগুলো নিতে এসেছিলেন নিরঞ্জনবাবু। সেজদাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সেজদা বলছেন, ঘুম আসছিল না ভাল। হঠাৎ সদর দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। মনে হল কেউ এসেছে বুঝি। ভয় ভয় করছিল। তবু কে যেন আমার পা দুটোকে টেনে নিয়ে গেল সদর দরজায়। দরজাটা খুলে দিলাম। চমকে উঠলাম। সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক, নিরঞ্জনবাবু।

বড় কাকীমা বললেন, আমাদের কাউকে ডাকলি নে কেন?

নদার পালোয়ান পালোয়ান চেহারা। প্রায় উত্তেজিত হয়েই বললেন, সেজদার এত ভয় তার উপর সব তাতেই ওস্তাদি সেজদার। থামিয়ে দিয়ে বড় কাকা বললেন, তারপর কি করলি তুই?

সেজদা বললেন, আমাকে বললেন, "আমি ভেতরে যাব। তোদের পাঞ্জাবী পায়জামা রেখে আমার কোটপ্যান্ট পরে যাব। আমি সকালের প্লেনেই ডেনমার্ক চলে যাচ্ছি।"

আমার আগে ভাগেই যেখানে রাখা ছিল সেই ভিজে কোট-প্যান্ট-টাই সেখানে এসে ওগুলো পরলেন। রেখে গেলেন পাজামা পাঞ্জাবী। আমার দিকে জানিনে কেন কটমট করে চেয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজাটা দিয়ে দিলাম।

আমরা সবাই অবাক। ছোটকাকীমা বললেন, কী কান্ড। এত সব ঘটল। আমরা কেউ জানলাম না। বড় কাকা গম্ভীর মেজাজের মানুষ। আরও গম্ভীর হলেন। কী বুঝলেন কী ভাবলেন — বললেন নদাকে, "তুই আমার সঙ্গে আয়।" নদাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বড় কাকা।

ঘন্টাখানেক সময়ও গেল না। ফিরে এলেন দুজনেই। হাঁপাচ্ছিলেন বড় কাকা। বললেন সবাইকে "নিরঞ্জনবাবু ভোর ভোর সময় এখানে আসতে পারেন না।" সেজদাকে দেখিয়ে বললেন "ও যা বলল, কী করে বলল বুঝতে পারছি না। কারণ রাত একটার সময়ই নিরঞ্জনবাবু মারা গেছেন। তাঁর 'ডেডবডি' ঘিরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। শাঁখারিটোলার বাড়িওয়ালা বললেন, "নিরঞ্জনবাবু যে ঘরে শুয়েছিলেন রাত একটা নাগাদ একটা চীৎকার শুনে পাড়ার লোকেরা ছুটে গিয়েছিলেন সেই ঘরে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে সবাই দেখেছেন নিরঞ্জনবাবুর মৃতদেহ মেঝেয় পড়ে আছে।"

ছোটকাকা ব্যস্তসমস্তভাবেই প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তাঁর পরনে তখন কী পোশাক ছিল, শুনলে কিছু?

বড় কাকা বললেন, হ্যাঁ, আমরা তো দেখেই এলাম। আমাদের দেওয়া সেই পাজামা-পাঞ্জাবী। আর আশ্চর্য। সেজদার কথার সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরঞ্জনবাবুর ছেড়ে রাখা সেই ভিজে কোট-প্যান্ট-টাই ফেরত নিয়ে যাননি তিনি ভোর রাতে। আমাদের বাড়িতেই ওগুলো পড়েছিল। এবং আমাদের অনেক অনেক আদরের ভালবাসার শ্রদ্ধার সেজদা নিরঞ্জনবাবুর অদ্ভুত মৃত্যুর তিনদিনের মাথায় একটা দুর্ঘটনায় মোটর চাপা পড়ে মারা গেলেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার।

নিরঞ্জনবাবু বলেছিলেন, সেজদার সঙ্গে দেখা হবে, মঙ্গলবার।

উপসংহার ঃ

এ ঘটনার আলোচনায় যাঁরা মৃত্যু রহস্য নিয়ে অভিজ্ঞ তাঁরা বলেছিলেন — আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে কেউ কেউ আগাম জানতে পারেন। নিরঞ্জনবাবু নামের ভদ্রলোক সত্যিই ডেনমার্ক থেকে শাঁখারিটোলার বাড়ি কিনতে এসেছিলেন, সত্যিই তিনি এক রাতে বৃষ্টি ঝরা দুর্যোগ মাথায় নিয়ে সার্পেন্টাইন লেনে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর পোশাক ছেড়ে আমাদের দেওয়া পাজামা পাঞ্জাবী পরে গিয়েছিলেন। তাঁর অবচেতন মন জানতে পেরেছিল শাঁখারিটোলার ঐ 'ভুতুড়ে' বাড়িতেই ওঁর মৃত্যু হবে। এবং আমাদের সেজদাকেও অ্যাকসিডেন্টেই মঙ্গলবার দিনেই মরতে হবে। তাই ...

শুধু জানা যায়নি এত লোক থাকতে সেজদাকেই কেন নিরঞ্জনবাবুর পছন্দ হয়েছিল।

হাসি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনের ওয়েটিং রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধু বেশ করে র‍্যাগ টেনে নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলাদেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে — ওহে, তোমরা যা বোঝ করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি।

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলাম ... রমেন ততক্ষণে চলে গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াশা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়েছিল। হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে — দেখ, আমার কিন্তু একটা **uncanny sensation** হচ্ছে, কেন বল তো?

আমি বললাম — কিভাবে **uncanny**? ভূত-টুত?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজিচেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে — তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন ...

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে —বিচিত্র নয়। আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই ছিলেন— সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি

অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে পড়ে আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষ রাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে ক্ষুর বার করে নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে — তারপর কি হলো তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিং রুমের বাথরুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়ার কি জন্যে একবার ঠিক ওইভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার ...

আমরা সকলে আমাদের বাথরুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ওপারে কেবল স্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টার এবং লেভেল ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিং রুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চায়ের দোকান। দিনমানে এমন কি ... সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তারপর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই — দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

গল্প ভাল জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে, দেখছো? Where there is a will, there is a way। আমি বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন — বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙ্গালী, চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন।

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে — এই যে মিত্তিরমশায়, আসুন আসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে — ইনিই এখানকার স্টেশন-মাষ্টার হরিদাসবাবু। আসুন আসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতল শূন্য কেদারাতে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে গরুড়ের মত বসে আছেন। মিত্তিরমশায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে, গোঁফ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ

স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি এখানে কতদিন আছেন মিত্তিরমশায় ?

আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে মেলে না, বাঙ্গালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হলো। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম — তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর — তা আপনারা কতদূর যাবেন সব ?

আমরা সাইকেলে দিল্লী যাব বলে বেরিয়েছি, ওপার থেকে আসছি কিনা ? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে গিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে। ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে ?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেনঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদান প্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে, গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিষটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রদীপ্ত করবার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম — হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিং রুমে ভূত-টুত নেই তো ? এ প্রশ্নের পরে সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথরুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হল এবং কেউ কেউ এমন ভাবে ভান করলেন যে এ স্টেশনের বাথরুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে — যত সব গাঁজাখুরি ...

হরিদাসবাবু অনেক্ষণ কোন কথা বলেননি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন — আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে গেলেন।

অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন এবং সে সময়

তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পুজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হলো প্রায় এক মাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরনো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-মধু সংগ্রহ করে কিনা পাহারা দেবার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোট ও স্টিমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি।

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্ন ছবি মুদ্রিত আছে।

তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো — শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে দেশে যাইনি, অনেক দিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের — বিশেষ করে জ্যোৎস্না ওঠা সুন্দরবনের ছবি অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড় ... নতুন পাতা-ওঠা গাব গাছের ও বন্য গোলগাছের সারি ... খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ — যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল। তাদের একটা বড় লঞ্চ বড় গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী — সবাই বাঙালী, সব সুদ্ধ সাত আট জন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হলো, তারপর একটু গান বাজনাও হলো। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হলো, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা ওঠা বনের

মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছিল ... দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল ... জোয়ারে জলে মগ্ন গোলগাছের আনত শাখাগুলো ভাটার পরে একটু একটু করে জল থেকে জেগে উঠতে লাগলো ... বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ওধারের তোলা উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরণের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভিতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এসব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম ঘটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছইয়ের ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন — আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান মঞ্জরী পড়ছি — বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো — হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ...

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার । ... হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে ... মাটি যেন কাঁপছে ... বোটটা যেন দুলছে।

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না — সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে। ...

বিনোদবাবু বললেন — কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ...

শব্দটি এত ক্রুর ও মর্ম্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো — আল্লা । আল্লা। কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন— কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হলো নৌকাটা সেখান থেকে সরানো যায় কিনা। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড় গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোন মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হলো। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি নিস্তব্ধ — চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার। আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষ রাত্রের চাঁদ ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টিম লঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে সে দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘর-বাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল গাছের সারি দেখে মনে হয় কোন সময়ে সে সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে, জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল। ...

তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে।

ভুতুড়ে রসিকতা

আনন্দ বাগচী

কতকাল আগের ঘটনা, তবু চোখ বুজলে সেদিনের কথা বলে মনে হয় আমার ক্যছে। কিছুতেই ভুলতে পারি না। এতকাল পরে এই কলকাতায় বসেও গায়ে কাঁটা দেয়। ঘটনাটা লিখতে বসে এই রাত্তিরে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে সত্যি সত্যি।

গণপতিদের বাড়ির দোতলার হলঘরে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। অবিশ্যি আড্ডা দিচ্ছিলাম বললে ভুল বলা হবে, আমরা আড্ডা দেবার ভান করছিলাম। আসলে ফটকের অপেক্ষা করছিলাম সেই বিকেল পাঁচটা থেকে। যদিও পাঁচটার সময়ে ও কদাচিৎই এখানে আসে, ওর আসতে আসতে সন্ধ্যা লেগে যায়। মাসীমা, মানে গণপতির মা যখন চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দেন এঘরে, ঠিক তার কিছু আগে ও এসে হাজির হয় কান এঁটো করা একমুখ হাসি নিয়ে। তারপর সিঙারার চুবড়ির খুব কাছ ঘেঁসে বসে পড়ে রোজ একটি মাত্র বাক্যই মুখস্থ সংলাপের মত আওড়ে যাবে, ইস, আজ বড্ড দেরি করে ফেললাম তাই না ?

আগে আগে জবাব দিতাম, এখন আর দিই না। এখন আমরা সবাই ওর ওপরে তিতিবিরক্ত, কেউ আর ওকে পছন্দ করি না। ওর মতিগতি বুঝে ফেলার পর অসহ্য লাগবারই কথা। আসলে ফটকে আমাদের বন্ধু-টন্ধু কেউ নয়, ফাঁক তালে আমাদের মধ্যে এসে ভিড়ে গেছে। গল্প করতে, আড্ডা দিতে আদৌ আসে না, আসে জম্পেশ খ্যাঁটনের লোভে। মাসীমার হাতের ওই বোম্বাই সাইজের গব্য ঘৃতে ভাজা সিঙারা আর প্রায় টেনিস বলের সাইজের কাঁচা গোল্লার কথা ভাবলে আমাদেরই জিবে জল আসে, তা ওর মত হ্যাংলা পেটুকের তো কথাই নেই। টপ স্পীডে মুখ চালিয়ে ও শেষ তক আমাদের ভাগেও ভাগ বসায়। তারপর চায়ের

কাপের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুষে খেয়ে মিনিট পাঁচেক ক্লাউন মার্কা হাসিমুখে কেমন ঘোরের মধ্যে বসে থাকে। শেষে যেন ধড়মড় করে জেগে উঠে বলে, ইস, আজ বড্ড দেরি করে ফেললাম তাই না? বলেই নিঃশব্দে ভ্যানিশ হয়ে যায়। ওর ওপরে আমরা চটেছি কি সাধে। কিন্তু গণপতি নিতান্ত ভদ্র ছেলে, ভালমানুষ। বাড়িতে কেউ বন্ধুর মত এলে তাকে অপমান করে তাড়ানো তো দূরের কথা, দুটো কড়া কথা বলাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক শলাপরামর্শ এঁটে আমরা আজ তৈরী হয়েছি ফটকেকে এমন শিক্ষা দিতে, যাতে নিজে থেকেই ও সটকে পড়ে, আর কখনও না এ বাড়িমুখো হয়।

কিন্তু এই গল্পের আগেও একটা গল্প আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তখন হঠাৎই বেকার হয়ে পড়েছি। সামনে ধূ ধূ ছুটি, অখন্ড অবসর, অথচ কিছুই করার নেই। আচমকা স্বাধীনতা পেয়ে গেলে যে দশা হয় আর কি। এটা ভাঙছি, ওটা জুড়ছি। গল্পের বই পড়েও যেন সময় কাটতে চায় না। সকাল বিকেল টো টো কোম্পানির বিনে মাইনের চাকরি বেছে নিয়েছি শেষ ইস্তক। আহিরীটোলায় বি কে পাল এভিনিউতে তখন দুপুরবেলায় ছেলেরা সাইকেল শিখত। শহর তখন কি রকম ফাঁকা ছিল বুঝতেই পার। ঘন্টা পিছু নামমাত্র ভাড়ায় সাইকেল পাওয়া যেত। সাইকেল জানাই ছিল আমাদের। শুধু পুরনো অভ্যেস ঝালাই করতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম আমরা।

দু'চাকার ভাড়া করা পক্ষীরাজ ছুটিয়ে আমরা শহরতলীর তেপান্তরের দিকে চলে গিয়েছিলাম সেদিন। শুধু আমাদের ঘোড়ার নয়, আমাদেরও তখন পাখা গজিয়েছে। একেক দিন একেক দিক আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়ি। আজ শুনে হাসবে তোমরা, কিন্তু তখন কলকাতা শহরটাকেই অনক বড় মনে হত, শহরতলী মানেই যেন বিদেশ। আহিরীটোলা থেকে চিড়িয়ার মোড় কিংবা ঘুঘুডাঙা তখন অনেক দূর। বি টি রোড দিয়ে এত বাস-মিনি-ট্যাক্সি তো তখন চলত না, সেটা ছিল পায়ে হাঁটার যুগ। টালার নতুন পুল পেরিয়ে সবে পাকপাড়ার মুখে পৌঁছেছি অমনি কে যেন ডাকল আমাদের নাম ধরে। আমি লালু আর অবনী সাইকেল থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি গণপতি। গণপতি সামন্ত। ওরিয়েন্টাল ইস্কুলে ক্লাস নাইনে এসে ভর্তি হয়েছিল, সামান্য বন্ধুত্ব ছিল এক সেকশনেই পড়ি বলে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবু পোশাকে-আসাকে আর হালচালে বুঝতাম ও আমাদের মতন না, বড়লোকের ছেলে।

হাতে একগোছা নেমন্তন্নের চিঠি নিয়ে ও এগিয়ে এল আমাদের দিকে: তোমরা এদিকে?

বেড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি? এদিকেই থাক বুঝি?

না। তবে এবার থেকে থাকব। বলেই সাইকেলের সীটের ওপর রেখে তিনটে খামের ওপরে আমাদের তিনজনের নাম লিখে দিয়ে বলল, রাস্তায় চিঠি দিলাম বলে মনে কিছু করো না। কাল আমাদের নতুন বাড়িতে গৃহ প্রবেশের নেমন্তন্ন। এসো কিন্তু।

মনে করব কি, নেমন্তন্নটা লুফে নিলাম। পরদিন গিয়ে দেখি, নতুন বাড়ি ঠিক না, একটা পুরনো বাগানবাড়িকেই ঘষে মেজে চমৎকার তিনতলা বানানো হয়েছে। আর এলাহি আয়োজন করেছেন গণপতির বাবা। দম ভর খেয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম, কিন্তু গণপতি ওর বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমরা ওর স্কুলের বন্ধু শুনে সবাই খুব খুশি। ওর মা তো বলেই বসলেন, বাঃ ভালোই বল, রোজ বিকেলে তোমরা বেড়াতে বেড়াতে চলে আসবে। নতুন এ পাড়ায় এসে গণুও বড্ড একলা হয়ে গেছে।

সেই থেকে আমরা গণপতির বন্ধু, রোজ আসি গল্প করতে। চারপাশ খোলামেলা, ফাঁকা, চমৎকার। বেড়াতে আসার মত জায়গাই বটে। দোতলার হলঘরটায় বসে নিরিবিলিতে জমিয়ে আড্ডা দিই। নিমাই ফাইফরমাস খাটে, চা জলখাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রথম রাউন্ডে আসে বড় এক গ্লাস করে ঘরে পাকানো গুলাবী লস্যি। আহিরীটোলার ঘিঞ্জি পাড়া আর মুড়ি তেলেভাজার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমরা। শুধু অস্বস্তি ওই ফটিকচন্দ্র। ও মাঝখানে এসেই যা রসভঙ্গ করে। আমাদের নিরঙ্কুশ আড্ডায় বেরসিকের মত থাবা বসায়। যেমন মোটা চেহারা, তেমনি মোটা বুদ্ধি ছেলেটার। আর তেমন কিম্ভূত রুচি। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী পরে, গায়ে এক গাদা সেন্ট ঢেলে যেন ধেড়ে নিতবর সেজে হাজির হয়। এই বয়সে এই চেহারায় কেউ আড্ডা দিতে আসে ভাবাই যায় না। সিঁড়ির মুখে ওর জুতোর শব্দ পাবার আগেই সেন্টের গন্ধ পাই। এসেই সরু মেয়েলি গলায় ওর মুখস্থ বয়ান ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে। লালু বাঁকা গলায় আমার কানে কানে বলে , বাবু কালচার।

শেষে থাকতে না পেরে একদিন বলেই ফেললাম গণপতিকে, তোমার বন্ধুটি ভাই কেমন যেন। কিছু মনে করো না।

ফটিক সেই মাত্র একরাশ সিঙারা আর কাঁচাগোল্লাকে গোল্লায় পাঠিয়ে উঠে গেছে।

গণপতি আমার কথায় চমকে উঠে বলল, কার কথা বলছ?

— ফটিকচন্দ্র। আমি গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলি, আড্ডাটাকে রোজ কেমন মাটি করে দেয়।

এবার দ্বিতীয় দফা চমকাবার পালা গণপতির। বলল, সে কি। ও তোমাদের

সঙ্গে আসে, আমি ভাবি তোমাদের বন্ধু।

লালু বলল, না। আমরা কস্মিনকালেও আগে ওকে দেখিনি।

অবনী বলল, গৃহপ্রবেশের দিন প্রথম দেখেছি। আমার পাশে বসে ছত্রিশখানা লুচি আর পঁচিশটা রসগোল্লা খেয়েছিল রাক্ষসের মত। কিরে, ঠিক না? আমার দিকে সমর্থনের চোখে তাকাল অবনী।

আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই। ওর খাদ্য তালিকাটা ওই রসগোল্লা আর লুচিতেই ঠেকে থাকেনি সেদিন। আমি তো ভেবেছিলাম ব্যাটা সেই রাত্তিরেই কলেরা হয়ে মরবে।

গণপতি বলল, যাঃ ওরকম বলিসনি। খেতে একটু ভালবাসে আর কি।

লালু চটে গেল। বলল, একটু! ওকে তুই একটু খাওয়া বলিস? খাওয়া ছাড়া ও জানেটা কী? এখানে কি ও আড্ডা দিতে আসে ভাবিস। রামছাগল ব্যাটা।

আমি চিন্তিত গলায় বললাম, যে ছাগলই হোক, আমি ভাবছি রহস্যটা কী। ও কে? কোত্থেকে আসে?

গণপতি মাথা চুলকে বলল, তাহলে বোধহয় পাড়ারই কেউ। বাবা নেমন্তন্ন পত্র ছড়িয়েছিল এন্তার। এই পাড়ারই কোন বাড়ির ছেলে। তবে প্রথম কদিন কিন্তু তোদের পেছন পেছনই এসেছে। তাই আমি ভেবেছিলাম —

অবনী বলল, রবাহূত বলে একটা কথা আছে, এবার বাংলার কোশ্চেনে বাক্য রচনা করতে দিয়েছিল। কিন্তু ওতো দেখছি রবাহূতও নয়।

লালু রাগী গলায় বলল, তাহলে এবার এর একটা বিহিত করা দরকার। একটা মোক্ষম দাওয়াই বাতলা দিকি, অবনী। তোর মাথায় তো নানারকম ফন্দি-ফিকির ভাল খোলে।

অবনী গণপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কী, রাজী?

গণপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারব না। কোন কৌশলে যদি ওকে ভাগাতে পার আমার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ছেলেটাকে দেখে মনে হয় ভীতু টাইপের, ওকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। তাহলে অন্তত সন্ধ্যেবেলা তোদের এই নির্জন বাড়ির ধারে কাছে আসতে সাহস পাবে না।

অবনীর মুখ চোখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লালু মৃদু আপত্তি জানাল, ভূতের ভয় ওর নাও থাকতে পারে।

না থাকলেও পাইয়ে দিতে পারব। — অবনী রহস্যময় হাসি হাসল, কিরে

গণু, তোদের নিমাইকে দলে পাওয়া যাবে না বল?

স্বচ্ছন্দে। — গণপতি ঘাড় হেলাল। শূন্যে একটা তুড়ি ফাটিয়ে অবনী বলল, তাহলে শোন।

আমরা ঘন হয়ে বসলাম। অবনী তার প্ল্যান রসিয়ে রসিয়ে বলল। এই ঘরে আগে নাকি একজন বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিল। খবরটা বাড়ি কেনার আগে গণপতির বাবা জানতে পারেননি। কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে হঠাৎ ভুতুড়ে উৎপাত শুরু হয়েছে। সন্ধ্যে থেকেই একটার পর একটা ঘরের বাল্‌ব ফিউজ হয়ে যেতে থাকে। আবার দিনের বেলা সেগুলি দিব্যি জ্বলে ওঠে। স্কাইলাইটগুলো খোলে আর বন্ধ হয়। দরজাগুলো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে শাটার টেনে রেখে যায়। ঘরের ভেতর যখন তখন গুলির শব্দ শোনা যায় আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এমনি ধরণের নানা উৎপাত। শুকনো মুখে, বেশ ভয় পাওয়া গলায় এই গল্পটা ফটকে আসার পর গণপতি বলবে। যেন সকলকেই বলছে, এই প্রথম। তার আগে কাল সকালেই একটা ফিউজ বাল্‌ব যোগাড় করে লাগিয়ে রাখতে হবে এই ঘরে। কালীপটকা ভরে দুটো মোটা মোমবাতি রেডি করে আনার ভার অবনী নিজেই নিল। ইলেকট্রিক আলোর বদলে ওই মোম দুটো জ্বলবে এই ঘরে। পটকা এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে মিনিট দশেকের মধ্যে ওর পলতেয় আগুন ধরে যায়। সেই সঙ্গে আর একটা কাজ সেরে রাখতে হবে। এ ঘরের স্কাইলাইটগুলোয় কালো সুতো বেঁধে সেই সুতোর প্রান্তগুলো ওপরের তলার জানলার শিকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে হবে এমনভাবে যাতে নিমাই তিনতলার ঘর থেকেই এ ঘরের স্কাইলাইট খুলতে আর বন্ধ করতে পারে।

জলখাবার দিয়ে যাবার পর নিমাইয়ের কাজ হবে এ ঘরের ভেজান দরজা দুটোয় নিঃশব্দে ছিটকিনি টেনে দিয়ে যাবে। তারপর মিনিট কয়েক পরে স্কাইলাইটের খেলা শুরু করবে। এদিকে ভূতের গপ্পো জমে উঠেছে। ওই ওই! বলে আমরা খুব ভয় পেয়ে যাব। তারপরে যেই দড়াম করে মোমবাতি নিবে যাবে আমরা আঁতকে উঠে জড়ামরি করে ছুটে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করব। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, সুতরাং খুলবে না। লালু অন্ধকারের মধ্যে কুকুর কান্নার ডাক ডেকে আমাদের পিলে চমকে দেবে। বহুদিনের প্র্যাকটিস, ওই ডাকটা ও মোক্ষম ডাকতে পারে। তারপর দেখা যাবে মজাটা।

পরের দিন যথারীতি আমরা আগে ভাগেই গণপতিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

সব ব্যবস্থা পাকা। আমরা চারজন অপেক্ষা করে আছি কিন্তু ফটকে আসছে না। ধীরে ধীরে বিকেল মরে সন্ধ্যে হল। বাইরে অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘন হল। মাসীমার পাঠানো সিঙারার গামলা আর কাঁচাগোল্লার থালা নিয়ে নিমাই এসে গেল। অবনী অগত্যা মোমদুটো জ্বেলে দিল। তারপর নিমাইকে ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বলল, তুই চলে যাস না, ধারে কাছেই থাকিস। ওই দাদাবাবু এলে আস্তে করে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে চলে যাবি। বাকি সব মনে আছে তো?

নিমাই দাঁত বের করে হাসল।

এক মিনিট দু মিনিট করে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় আমাদের হাতের আঙুল ঠান্ডা হয়ে এসেছে। গরম সিঙারাও জুড়েয়ে আসছে ক্রমশ, কিন্তু আমাদের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। গোটা প্ল্যানটা না আপসেট করে দেয় ফটকে। হতভাগা কি জানতে পেরে গেছে আমাদের মতলব। কিন্তু তাই বা কি করে হবে। দিন বুঝেই কি ব্যাটা আজ কামাই করে বসল। এরকম টেনশন নিয়ে কি বসে থাকা যায়? মোম দুটো তো আর বসে নেই, নিয়ম মাফিক গলে ছোট হয়ে আসছে। যেন বোমার পলতেয় আগুন ধরিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি।

লালু আর থাকতে না পেরে ককিয়ে উঠল। মোমবাতি না ফেটে যায় দুম করে।

চুপ কর। অবনী ধমকে উঠল, যখন তখন ফাটলেই হল। আমি ঘড়ি দেখছি না? এখনো পাক্কা ছ মিনিট বাকি।

সস্‌স্‌। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে গণপতি ইশারা করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার মত সেন্টের তীব্র গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছাল। পরের মুহূর্তেই জুতোর শব্দ। ফটকে মুখ বাড়াল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্ত থমকে ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, ইস। আজ বড্ডই দেরি করে ফেললাম, তাই না?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ। সিঙারাগুলো বোধহয় এতক্ষণে ঠান্ডা হয়েই গেল।

অ্যাঁ। বলেই ফটকে গামলা থেকে সিঙারা তুলে নিল, এক থাবায় দুটো। তারপরেই সিঙারায় জলহস্তীর মত কামড় বসাতে বসাতে বলল, একী মাইরি, তোমরা ভূতের মত মোম জ্বালিয়ে বসে আছ কেন?

লালু তাড়াতাড়ি বলল, বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে।

অবনী বলল, তাইতো গণপতি, আর একটা বালব কিনিয়ে আন না নিমাইকে দিয়ে।

কানে পৌঁছাবার মত নয় তবু আমরা টের পেলাম দরজায় ছিটকিনি আঁটা হয়ে গেল। শব্দটা ভুল শুনিনি তার প্রমাণ লালু আমাকে চিমটি কাটল।

গণপতি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতে একটা সিঙারা তুলে নিয়েছিল, বলল, লাভ নেই। সেই তো আবার ফিউজ হয়ে যাবে।

ফিউজ হয়ে যাবে। তার মানে? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে অবনী গণপতিকে চোখ টিপল। কিন্তু ফটকের তখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। তার হাত একবার গামলা, একবার থালা ছুঁয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে আজ দেরিতে আসার জন্যে বুঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে। গণপতি অবনীর ধরতাই পেয়ে সবিস্তারে গল্পটা শুরু করল। বেশ জোরে জোরেই, যাতে ফটকের কর্ণগোচর হয় প্রতিটা শব্দ।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে হল, কারণ ফটকে খাওয়া থামিয়ে বার দুই গণপতির মুখের দিকে তাকাল। এমন সময় বেশ শব্দ করে স্কাইলাইট দুটো নাচানাচি শুরু করে দিল।

ওই ওই! আমি আঁতকে ওঠার মত করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

লালু এক হাত লাফিয়ে উঠে 'উরি বাবা' বলে আমাকে জাপটে ধরল। অবনী পাংশু মুখে বলল, এ কী রে গণা। এ যে ভুতুড়ে কান্ডই শুরু হয়ে গেল।

এই তো সবে শুরু। গণপতি বলল, একটু বস, সবই নিজের চোখে দেখতে পাবে। কিভাবে যে আমরা দিন কাটাচ্ছি ... রাতে ঘুমোতে পারি না, ভাইরে।

ইস বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ! শেষ কাঁচাগোল্লাটা মুখে পুরে দিয়ে ফটকে আচমকা উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা —

তার মুখ দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছে। টের পেয়ে আনন্দই হচ্ছিল আমার।

ভয় পাওয়া গলা করে আমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলাম, বস! যাবে কী। যেতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াবে? দেখছ না কী শুরু হয়ে গেছে!

ফটকের মুখ দিয়ে কেমন গোঁ গোঁ শব্দ বেরলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমাদের বহুক্ষণের উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে পরপর দুটো বোমা ফাটার আওয়াজ হল। মোমবাতি দুটো ছিটকে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকার। হুড়োহুড়ি। অবনীর গলা পেলাম দরজার কাছ থেকে। দরজায় দুমদুম আওয়াজ করছে ভয়ার্ত গলায় চেঁচাচ্ছে, খোল খোল

দরজা খোল। এ কী। কে আটকে দিল বাইরে থেকে?

একটা কুকুরের কান্না ঘরের অন্ধকারকে যেন ফালা ফালা করে দিল এই সময়ে। সেই সঙ্গে গণপতির আর্তনাদ, ছাড় ছাড়। একটা ঝটাপটির শব্দ। পেতলের গামলা আর থালাটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর ঝনঝন করে। হঠাৎ মনে হল বরফের মত ঠান্ডা দুখানা হাত সাঁড়াশির মত আমার গলা চেপে ধরছে। প্রাণপণে চেঁচাতে গেলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে গোঙানীর মত সামান্য একটু আওয়াজ বেরল মাত্র। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমাদের তৈরী ছকের বাইরে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে। আর রক্ষা নেই।

সেকেন্ড কয়েকের জন্য বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। চোখ মেলে দেখি মেঝের ওপরে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি। সিলিং-এর আলোটা দিব্যি জ্বলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অবনী আর লালু ঘরের এককোণে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। বিধ্বস্ত চেহারায় গণপতি পড়ে আছে তক্তপোশের ওপর চোখ উল্টে। ধড়মড় করে উঠে গণপতির কাছে গেলাম। না, বেঁচেই আছে, তবে অজ্ঞান।

অতি কষ্টে বলল, জল শিগগীর জল আন।

অবনী আর লালু দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও জলের কুঁজো নেই। জলের গেলাসগুলো উলটে জল গড়াচ্ছিল মেঝেময়। দুই হাতে সেই জল থাবড়ে আমি গণপতির চোখেমুখে জলের ছিটে দিলাম। লালু ছুটে গেল দরজা খুলে নিমাইকে ডাকতে। কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

অবনী আঁতকে উঠে বলল, আরে একী কান্ড! ফটকে, ফটকে গেল কোথায়?

সত্যি আমাদের কারো মনেই ছিল না ফটিকের কথা। তক্তপোশের নিচে টিচে সব জায়গা দেখা হল, ফটকে ভ্যানিশ। একেবারে কর্পূরের মত উবে গেছে যেন।

এরপরে আর কোনদিন ফটকে ও বাড়িতে আসেনি। আমরাও যাইনি। পরে শুনেছিলাম ঘটনাটা। ফটিকচন্দ্র কুন্ডু বলে একটা ছেলে সত্যিই ছিল গণপতিদের পাড়ায়। কিন্তু সে ছিলই, এখন নেই। কমাস আগে নাকি দীঘার দিকে কোথায় বরযাত্রী হয়ে যাচ্ছিল বাসে করে। অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। তারপর তাকে ওপাড়ার নেমন্তন্ন বাড়িতে কেউ কেউ দেখেছে। ওই বরযাত্রীর পোশাকেই। গিলে করা পাঞ্জাবী, চুনোট করা ধুতি, গায়ে সেন্টের গন্ধ। ...

ভূতেশ্বরের দরবারে কোয়েল

জগদীশ দাস

মিশনারী স্কুলের ছাত্রী কোয়েল। একদিন ছুটির পর একলা বাড়ি ফিরছিল। পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট। গায়ে টি সার্ট। পায়ে সাদা কেডস। ছিপছিপে সুশ্রী চেহারা।

কোয়েল তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতে পড়ে থাকা একটা কলার খোসায় পা পড়ে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মাথা গিয়ে লাগে একটা থান ইটে। কোয়েল মরে যায়। ওর আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এল। আত্মা হাল্কা। গ্যাস বেলুনের মত। আপনি উপরে ওঠে। তবুও কিসের যেন একটা টান অনুভব করে সে। সেই টানে ফুরফুরে বাতাসে গা ভাসিয়ে পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যে চলে যায়।

মহাশূন্যে শুধু বিরাট বিরাট গাছ-গাছালি। টান শেষ হতেই একটা গাছের নীচে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে কোয়েল। এতটা উপরে উঠে এসেও ক্লান্তি নেই। শুধু কেমন যেন একটা ঘোর ঘোর ভাব।

এই ঘোর ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগে কোয়েলের। তারপর মনে পড়ে যায় আঘাতে মরার পর ও পৃথিবী ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। আচ্ছা, এখান থেকে কি পৃথিবী দেখা যায়? মুখ নিচু করতেই চোখে পড়ে শুধু ঘন কুয়াশা আর কুয়াশা।

কতক্ষণ সে বসে আছে খেয়াল নেই। এক সময় চিমড়ে চেহারার এক ছোকরা সামনে এসে দাঁড়ায়। রং কালো, মাথার চুল খাড়া খাড়া, চোখ গোল ভাঁটার মতো। পরনে একফালি কালো ন্যাকড়া। খোনা গলায় জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মিছিলে যাসনি বুঝি?

কোয়েল ভ্যাবাচ্যাকা। জিজ্ঞেস করে, কিসের মিছিল?

চিমড়ে চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, তুই কি এখানে নতুন আমদানি হয়েছিস? জানিস না ভূতেশ্বরের কাছে রোজ মিছিল যায়?

— একটু আগে এখানে এসেছি। এসব কিছু জানি না।

চিমড়ে বেশ মুরব্বির মতো বলে, অঃ, তাই এখানকার হালচাল জানিস না। ঠিক আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের একটাই দাবী, ভূতেদের এই অবস্থার আশু অবসান চাই।

— তার মানে?

— বারে, অপঘাতে মৃত্যু হলেই তো আত্মা ভূত হয়ে যায়। সে আত্মার গতি হতে অনেক ফ্যাচাং।

— কেন?

— আরে, মৃত্যু স্বাভাবিক হলে তো আত্মা সরাসরি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে চলে যায়। তিনি খাতা পত্তর দেখে চটপট আত্মাকে হয় স্বর্গে পাঠান, নয়তো নরকে চালান করে দেন। দেরি হয় না বলে সেখানে আত্মাদের ভিড় কিংবা লাইন হয় না।

— ভূতেশ্বর কি পারেন না?

— না। অপঘাতে মৃত্যু হলেই তো ভূতেশ্বরের কাছে চলে আসে। তার আগে তো নয়। তাই তিনি আগে ভাগে কি করে জানবেন কোন কোন আত্মা আসবে। তাছাড়া এলেই তো আত্মার মুখচোখ দেখে হুটহাট করে ইচ্ছেমত স্বর্গে কিংবা নরকে পাঠাতে পারেন না।

— কেন অসুবিধা কোথায়?

— বারে, চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আরজি পাঠিয়ে জানতে হবে না আত্মা আস্তিক কি নাস্তিক?

— এত কড়াকড়ি কেন?

— কড়াকড়ির কারণ একটাই। নাস্তিকরা বড় ঘোঁট পাকায়। দারুণ কুচুটে। ওরা যদি কোন রকম ফাঁক-ফোকর দিয়ে স্বর্গে ঢুকে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে ছাড়বে স্বর্গে। আর আস্তিকদের যদি ভুল করে নরকে পাঠানো হয়, তাহলে যমরাজের শাপমুন্যি খেতে হবে না? সেই ভয়েই তো ভূতেশ্বর সদাই তটস্থ।

— তুমি এখানে কতদিন আছ?

চিমড়ে বেশ হতাশ সুরে বলে, তা তো হয়ে গেল অনেক কাল। এতদিন ভূত

হয়ে থেকে ঘেন্না ধরে গেছে নিজের ওপর। আর ভাল্লাগে না। কি যে হবে ভেবে আর থই পাই না।

— এই দেরী হওয়ার কারণটা কি বল তো?

— আর বলো না। চিত্রগুপ্তের দপ্তর হচ্ছে হরি ঘোষের গোয়াল। ওদের গয়ংগচ্ছ ভাবের জন্যেই তো দেরি হচ্ছে।

— তাহলে ভূতেশ্বরের দোষ কি বল?

চিমড়ে খুব তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে বলে, উনি নিজে গিয়ে আমাদের জন্যে একটু তদ্বির তদারকও করতে পারেন। কিন্তু তাও তো করেন না।

কোয়েল বুঝে গেছে যে এখানে ওকে অনেক হ্যাপা সামলাতে হবে। কতদিনে যে গতি হবে তারও তো ঠিক-ঠিকানা নেই। যাক্‌গে, ভেবে আর কি হবে? আগে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দরকার। জিজ্ঞেস করে, চারদিকেই তো ঝোপঝাড় জঙ্গল। এখানে তোমাদের ডেরা কোথায়?

চিমড়ে ঠোঁট উলটে বলে, ভূতেরা তো সব গাছ-গাছালিতেই থাকে। তুমিও একটা আস্তানা ঠিক করে নাও না।

মনে মনে আঁতকে ওঠে কোয়েল। বলে কী? তাহলে তো ঝড় জল ঠান্ডায় কষ্টের সীমা -পরিসীমা থাকবে না। জিজ্ঞেস করে, তোমাদের অসুবিধে হয় না?

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে চিমড়ে। আরে, থাকতে থাকতে গা সওয়া হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করে কোয়েল, ভূতেশ্বর কোথায় থাকেন?

চোখ বড় করে চায় চিমড়ে। একটু ঘুরে ডান হাত তুলে দেখায়। পারিষদদের নিয়ে ঐ দূরে সাদা পাহাড়ের গুহায় থাকেন। গুহাটা খুব সাজানো। ভোগবিলাসের কত রকম সামগ্রী রয়েছে। আবে, ভূতেশ্বর বলে কথা। তিনি তো এসব সুখ-সুবিধা ভোগ করবেনই।

চট করে কোয়েলের মাথায় একটা মতলব খেলে যায়। দেখাই যাক না ওকে একটু বাজিয়ে? কি বলেন? আচ্ছা ভূতেশ্বরের সঙ্গে কি দেখা করা যায়?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবার সঙ্গে উনি দেখা করেন, বড় অমায়িক।

চিমড়ে পথ দেখিয়ে দিল। কোয়েল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে গুহার সামনে গিয়ে হাজির হল। গুহার মুখটায় চারজন পা ছড়িয়ে বসে গুলতানি করছে। সবাই বেঁটে খাটো জোয়ান। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। রং কালো। একজন বেশ মেজাজী গলায় জিজ্ঞেস করে, কি চাই?

— আজ্ঞে, ভূতেশ্বরের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

— ওদিকে যাও।

কোয়েল গুটিগুটি পায়ে ভেতরে একটা চৌকো চত্বরের কাছে চলে যায়, চত্বরে ফরাস পাতা। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন থুড়থুড়ে বুড়ো। সারা মাথায় টাক। টাক ঘিরে শনের নুড়ির মত কয়েক গাছি চুল। গোলগাল চেহারা। থেবড়া নাক। গায়ের রং মিশকালো। তারকেশ্বরের কুমরোর মতো বিরাট ভুড়িটা থলথল করছে, খালি গা।

কোয়েলকে দেখে বুড়ো বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করেন, কি চাই?

প্রশ্নকর্তা বোধহয় ভূতেশ্বর। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য দুহাত জোড় করে নম্রভাবে কোয়েল বলে, আমি কি পূজ্যপাদ ভূতেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছি?

বাঃ, কথা বলার ধরণটা বড় সুন্দর, ভূতেশ্বর একটু সিধে হয়ে বসে শুধু মাথা নাড়েন।

কোয়েল হাত কচলে আবার বলে, কিছুক্ষণ আগে আমি পৃথিবী থেকে এসেছি।

কোয়েলের বিনয় ভাব দেখে খুশী হন ভূতেশ্বর। আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে অমায়িক ভাবে আদেশ দেন, তাহলে এখানে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে নাও। সময়মত তোমার ডাক আসবে।

ডাক যে কবে আসবে এবং আদৌ আসবে কিনা কে জানে? তাই এখনই একটু ফয়সালা করা দরকার, একটু মাথা চুলকে শান্ত গলায় বলে কোয়েল, আজ্ঞে আমার একটা আরজি ছিল।

— বলে ফেল কি তোমার আরজি?

এবার কোন ভণিতা না করে একদম সোজাসুজি কোয়েল বলে, দেখুন, আমি না আস্তিক, না নাস্তিক। তাই স্বর্গে না নরকে কোথায় আমায় পাঠানো হবে আগে জানতে চাইছি।

আশ্চর্য। শান্ত মেয়েটার বাক্যির কি ধার। এটুকু বাচ্চা মেয়ে এত সেয়ানাও হয়? হায় হায়, দিনকাল কত বদলে যাচ্ছে। আরও কত কিনা দেখতে হবে। হাসি মুখে বলেন, মানে, মানে, তুমি ভগবানে বিশ্বাসও কর না, আবার অবিশ্বাসও কর না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভূতেশ্বরকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন অদ্ভুত চেহারার লোক। পারিষদদের

দিকে বেশ অসহায় ভাবে তাকান ভূতেশ্বর, যদি কোন বিজ্ঞ পারিষদ একটা উপায় বাতলে দেন। নাঃ, কারুর মুখে কোনো রা নেই। সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। এখন কি করবেন ভেবে কুল কিনারা পান না। মুখে বলেন, তা হলে তো তোমায় নিয়ে একটা সমস্যায় পড়া গেল।

ফিক করে হেসে ফেলে কোয়েল। বলে, আজ্ঞে, সমস্যার তো কিছু নেই। স্বর্গে কিংবা নরকে ঢুকতে গেলে ফেঁকড়া। গায়ে মার্কা না থাকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। তাই চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আমার নামটা পাঠাবেন না।

— বল কি, তা কি কখনও হয়?

কোয়েল এবার বেশ ধমকে বলে, দেখুন, আপনার নিজের কোন দপ্তর নেই, নেই কোনো খাতাপত্তর। চিত্রগুপ্তের ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হয়। তাই কবে যে আমার ব্যাপারটা ফয়সালা হবে তারও তো কিছু ঠিক নেই। তাই না?

যথার্থ কথা। বলে মাথা নাড়েন ভূতেশ্বর।

হঠাৎ একটু রাগ দেখিয়ে বলে কোয়েল, কাল আমি মিছিলের সঙ্গে এসে সকলের সামনে আপনাকে নানা প্রশ্নে জেরবার করে ছাড়বো। আর এও বলবো যে ভূতেদের জন্যে কোনো কাজ আপনি করেন না। শুধু তারে-নারে করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। সবশেষে দাবী তুলবো যে আপনার এই ভূতেশ্বরের পদে থাকার কোন যোগ্যতা নেই।

ভূতেশ্বরের কোঁচকানো মুখ আরও কুঁচকে যায়। এতদিন তো বেশ ভুজং ভাজাং দিয়ে চলছিল। এই বিচ্ছু মেয়েটার জ্বালায় শেষমেষ না সবার সামনে নাকাল হতে হয়। বড় শ্বাস ছেড়ে বলেন, তা কি করতে বল?

কোয়েল বলে, দেখুন, পৃথিবীতে আস্তিক নাস্তিক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। হেসেখেলে সময় কাটিয়ে দেয়। কোন ঝামেলা নেই। তাই দয়া করে আমায় আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন।

এই বয়সে উটকো ঝক্কি-ঝামেলা আর ভালও লাগে না ভূতেশ্বরের। পারেনও না আজেবাজে হেপা সামলাতে। এরকম ঘরজ্বালানি আপদ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই মঙ্গল। তবুও পারিষদদের একটা মৌখিক মত নেয়া দরকার। তাই জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের অভিমত কী?

এমন জাঁহাবাজ মেয়ে পারিষদদের চোখে কখনও পড়েনি। বাঃ বাঃ, মেয়ে নয় তো সিংহী। সবাই ঢোক গেলে আর মাথা নাড়ে। শুধু একজন মিনমিন করে বলেন, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

যাক বাঁচা গেল। পারিষদদের সম্মতি পাওয়া গেছে। মনের ভাব স্বাভাবিক রেখে বলেন, তা এত করে যখন অনুনয়-বিনয় করছো, তোমার আবদার তো আর ফেলা যায় না। তাহলে ফিরেই যাও আবার পৃথিবীতে।

হুররে। কি মজা। খুশী চেপে জোড় হাতে কোয়েল প্রথমে ভূতেশ্বরকে, পরে পারিষদদের নমস্কার করে ধীরে ধীরে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর হুস করে চলে আসে আগের গাছটার কাছে। চারদিক সুনসান। এখন চলে গেলে কেউ টেরও পাবে না। তাই চট্ করে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে দেয়। তারপর সামনের দিকে শরীরটা হেলিয়ে মাথা নীচু করে দেয় ডাইভ। সুন্দর ফ্রন্ট ডাইভ। মাধ্যাকর্ষণের টানে হুহু করে নীচে নামতে থাকে। নিমেষে আবার নিজের দেহের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে কোয়েল।

ভূত আছে কি নেই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আজ তোমাদের এমনই এক ভূতের কাহিনী শোনাচ্ছি। এ কাহিনীর সঙ্গে আমি কিছুটা জড়িত। কাজেই এটা যে নির্ভেজাল সত্যি কাহিনী এ বিষয়ে তোমাদের কাছে আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়, নাম আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ.বি.এল., কিন্তু ওকালতি করেন না। বেসরকারী অফিসের আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার।

থাকত পাইকপাড়ায়। এক বান্ধবীর সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে।

বান্ধবীটি এক স্কুলের শিক্ষিকা।

জীবন দুজনের বেশ ভালই কাটছিল. ছুটির দিন সিনেমা, কিংবা আরো অনেক বান্ধবী মিলে বনভোজন, অথবা গড়ের মাঠে প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া।

হঠাৎ আরতির বিয়ে ঠিক হলো। পাত্রও উচ্চশিক্ষিত। এক যন্ত্রপাতির কারখানার আধা মালিক।

আরতি আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন। আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দিন।

তিন মাস ঘোরাঘুরির পর কালিঘাট অঞ্চলে এক বাড়ির সন্ধান মিলল।

পার্কের সামনে প্রায় নতুন বাড়ি। সদ্য রং করা হয়েছে। খান তিনেক কামরা। বারান্দা, বাথরুম, আবার এরই মধ্যে একফালি উঠানও আছে।

সেই অনুপাতে ভাড়াও খুব বেশী নয়। দুশো কুড়ি। বাড়ির মালিক পাশের বাড়িতেই থাকেন।

এ বাড়ি আরতির পছন্দ হয়ে গেল।

শুধু আরতির নয়, আরতির স্বামী আশিসেরও।

আর দেরি না করে সে দিনই 'দু' মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হলো।

মাসখানেক পর আরতির বাসায় বেড়াতে গিয়ে খুব ভাল লাগল।

নতুন আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। উঠানের পাশে সারি সারি টব।

দেশি ফুল বেল, জুঁই যেমন আছে, তেমনি বিদেশী ফুল ডালিয়া, পপি, হলিহক্‌ও রয়েছে।

এমন বাসা খুঁজে দেবার জন্য আরতি-আশিস দুজনেই আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিল। এরপর অনেকদিন আরতির সঙ্গে দেখা হয়নি।

অফিসের কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল সেখানে মাস তিনেক কাটিয়ে কানপুর। সেখানেও এক মাসের ওপর লেগে গেল। কলকাতা ফিরলাম প্রায় পাঁচ মাস পর।

এক ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্প করছি, আরতি এসে ঢুকল।

প্রথম নজরেই মনে হলো চেহারা একটু ম্লান। আরতি ভিতরে চলে গেল।

বন্ধুরা বিদায় হতে আমিও ভিতরে গেলাম।

দেখলাম, আরতি চুপচাপ সোফার ওপর বসে আছে। আমাকে দেখে বলল— আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কি বল ? শরীর খারাপ নাকি। চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে।

আরতি মুখ তুলে বলল — রাত্রে একেবারে ঘুম হচ্ছে না।

সে কি। ডাক্তার দেখাও, নইলে শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।

ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।

তার মানে ?

মানে বাড়িটা ভাল নয়।

সেকি, স্যাঁতস্যাঁতে বা অন্ধকার এমন তো নয়। রোদ বাতাস প্রচুর।

সে সব কিছু নয় অন্য ভয় আছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আরতি কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপরে আস্তে আস্তে বলল — ও বাড়িতে আমরা দুজন ছাড়াও অন্য একজন আছে।

অন্য একজন আছে ?

হ্যাঁ, তাকে মধ্যে মধ্যে গভীর রাতে দেখা যায়। অন্য লোক হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। শুনতেই চাইত না।

কথাগুলো বলবার সময়ে দেখলাম আরতির মুখচোখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে বলল, দড়ি হাতে নিয়ে রাত্রে একটা লোক ঘুরে বেড়ায়।

আমি বললাম এরকম যখন ব্যাপার, তখন না হয় এবাড়ি ছেড়ে দাও। অন্য কোথাও বাড়ি খুঁজি।

আরতি উত্তর দিল তাতেও তো মুশকিল, আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেননি বাড়ির দেয়াল ভেঙেচুরে আমি দুটো ঘর বাড়িয়েছি। বাইরেটা চুনকাম করেছি,

ভিতরে রং দিয়েছি। গ্যাস বসাবার জন্য রান্নাঘরেও অনেক অদল বদল করেছি। অবশ্য এসব বাড়িওয়ালার মত নিয়েই করেছি। ভাড়া থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা কেটে রাখছি। সে টাকা শোধ হতে বছর দুয়েক লাগবে। তার আগে বাড়ি ছেড়ে দিলে আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

একটু ভেবে বললাম — ঠিক আছে আমি একবার তোমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব। তিনি কি বলেন শুনি।

দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, বিপুলকায়। কলকাতায় কিছু বাড়ি আছে, কাঠের ব্যবসা। একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল। আমাকে দেখে ওঠবার চেষ্টা করল পারল না।

কি খবর? আমার কাছে হঠাৎ?

আরতির কাছে শোনা সব কিছু বললাম। শেষকালে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক করে বলুন তো? ও বাড়িটার কোন দোষ আছে?

দোষ মানে?

মানে, কেউ ও বাড়িতে অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন। আগের কোন ভাড়াটে?

বাড়িওয়ালা মাথা নাড়ল।

না মশায়, এর আগে মাত্র দুঘর ভাড়াটে ছিল। অপঘাতে তো দূরের কথা এমনিই মৃত্যু কারো হয়নি। তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন পায়চারি করার জন্য চাঁদে যাচ্ছে, তখন কি সব ভূত প্রেতের কাহিনী আমদানি করছেন।

তর্ক করলাম না। অনেক বিষয় আছে তর্ক করে বোঝান যায় না। স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেখানে সম্ভব নয়।

চলে এলাম।

তারপর মাস দুয়েক আরতির কোন খবর নেই।

আমি নিশ্চিন্ত। যাক অপদেবতার উপদ্রব আর নেই, সব শান্ত।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে একদিন সকালে আশিস এল।

কোটরগত চোখ, বিবর্ণ মুখ, ঘোলাটে দৃষ্টি। বললাম, কি হে শরীর খারাপ নাকি? আরতি কেমন আছে।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল — একটু জল দিন।

জল শুধু খেল না, মুখে চোখেও দিল। তারপর বলল, আরতিকে টালিগঞ্জে তার দিদির বাড়ি দিয়ে এসেছি। কালিঘাটের বাড়িতে আর আমাদের থাকা চলবে না।

কেন, কি হল?

আরতির কাছে তো কিছু কিছু শুনেছেন। আমি কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু দেখিনি।

কোন শব্দও শুনিনি। সেইজন্য এতদিন আমি আরতিকে ঠাট্টা করতাম। তাছাড়া ভূত আত্মা ওসবে আমার কোনদিন কোন বিশ্বাস নেই।

কাল একটা কাজে হাওড়ায় আটকে পড়েছিলাম। বাস বন্ধ, ট্যাক্সিও পাই না। কিছুটা হেঁটে তারপর ট্রামে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় বারটা হয়ে গিয়েছিল।

আরতি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

যাক, আরতিকে খাবার সাজাতে বলে আমি হাত মুখ ধোওয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

নীচু হয়ে বেসিনে মুখ ধুয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথায় ঠক করে কি একটা লাগল।

বাথরুমে আবার কে কি রাখল।

একটু কমজোর বাতি। কিন্তু সে বাতিতেও দেখতে কোন অসুবিধে হল না।

ঠান্ডা একটা বরফের স্রোত আমার মেরুদন্ড বেয়ে নেমে গেল।

বাথরুমটা অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া। আগে টালির ছাদ ছিল। আমরাই খরচ করে অ্যাসবেসটস দিয়েছিলাম।

ওপরে দুটো কাঠের কড়ি। একটা কড়িতে দেহটা ঝুলছে।

গলায় দড়ির ফাঁস। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। দুটো চোখ আধবোজা, জিভটা অনেকখানি বের হয়ে গেছে। বোধহয় জিভের ওপর দাঁতের চাপ পড়েছিল। তাই জিভটা কেটে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে। কিছুটা দেহের ওপর, কিছুটা মেঝেতে।

পরনে আধময়লা ধুতি, কাঁধে পৈতে।

মাথা উঁচু করবার সময় ঝুলন্ত দেহের পা আমার মাথায় ঠেকে গিয়েছিল। আমি সব কিছু ভুলে আরতি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আরতি আমার অপেক্ষায় খাবার টেবিলে বসেছিল।

আমার চিৎকারে ছুটে এসে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে সে বুঝতে পারেনি।

তারপর ওপর দিকে চোখ যেতেই 'ও মাগো' বলে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে অজ্ঞান।

আরতির মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনরকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম।

তারপর বাকি রাতটা দুজনে বাইরের ঘরে বসে কাটালাম। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ট্রামে উঠে আরতিকে নিয়ে যখন তার দিদির বাড়ি এলাম, তখন জ্বরে আরতির গা পুড়ে যাচ্ছে। দুটো চোখ করমচার মত লাল।

আমি চুপ করে সব শুনলাম।

আশিসের কথা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম, আরতি এখন কেমন আছে?

খুব ভাল নয়। বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে, ওই লোকটা, ওই লোকটাই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দড়ি হাতে। আমি এখানে থাকব না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

অবশ্য আরতির জন্য খুব চিন্তা নেই। ভয়টা কেটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সব কিছু নিজের চোখে দেখবার দারুণ ইচ্ছে হলো। এমন তো নয়, এক সময় দরজা খোলা পেয়ে বাইরের কোন লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মহত্যা করছে?

সে হয়তো আত্মহত্যা করবার নির্জন একটা জায়গা খুঁজছি ।

তাই আশিসকে বললাম চল একবার নিজের চোখে দেখে আসি। তাছাড়া তোমরা ব্যাপারটাকে ভৌতিক ভাবছ, তাতো নাও হতে পারে। পুলিশে খবর দেওয়াও তোমাদের একটা কর্তব্য। তারা এসে মৃতদেহের ভার নেবে।

আশিস আমার সঙ্গে চলল।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

বাথরুমের মধ্যে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও কিছু নেই। সব পরিষ্কার।

আশিসকে জিজ্ঞাসা করলাম — কই হে? কোথায় তোমার ঝুলন্ত দেহ? রক্তের একটি ফোঁটাও তো কোথাও দেখছি না। আশিস রীতিমত অপ্রস্তুত।

সব চোখের ভুল বুঝলে?

আশিস মাথা নাড়ল।

কিন্তু দুজনেই ভুল দেখলাম?

ওরকম হয়। একজনের ভয় আর একজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও এক ধরণের কাল্পনিক দৃশ্য দেখায়। তুমিও দেখ না কাল রাতে তুমি যদি সত্যিই ওরকম একটা দৃশ্য দেখে থাক, তাহলে আজ কোথাও কিছু নেই, তা কি হতে পারে? এইখানটাই তো দেখেছিলে?

মুখ তুলে ওপরের দিকে দেখেই আমি থেমে গেলাম?

কি আশ্চর্য, এটা তো আগে দেখিনি। কড়ির সঙ্গে একটা মোটা দড়ি বাধা। দড়িটা ফাঁসের আকারে ঝুলছে।

অস্বীকার করব না, আমার হাত পা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেল। বুকের দাপাদাপি এত জোরে যে ভয় হলো, স্পন্দন থেমে না যায়। ও দড়ির ফাঁস তো প্রথমবার দেখিনি। আরও অবাক কান্ড দড়ির ফাঁসটা 'অল্প দুলছে' অথচ কোথাও বাতাস নেই।

বাইরে বাতাস থাকলেও বাথরুমে বাতাস ঢোকবার কোন সুযোগই নেই।

আশিসের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এটা যে ভৌতিক ব্যাপার নয়, কোন মানুষের কারসাজি তা হওয়াও সম্ভব নয়। কোন যুক্তি তর্ক বিস্তার করেও সমাধান করতে পারলাম না।

আরতিরা আর ও বাড়িতে ফিরে যায় নি। ভবানীপুরে একটা বাড়ি ঠিক করে উঠে গিয়েছিল। আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও।

এ ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পর এক বিকেলে কালিঘাট পার্ক দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আরতির বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেঞ্চে বসে আছে।

আমি তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম — মশাই সত্যি কথা বলুন তো। বাড়িটার কি রহস্য? আমার আত্মীয়টি তো থাকতে পারল না, পালাল।

প্রথমে কিচ্ছুতেই বলবে না। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে বলল।

এক বুড়ো ভদ্রলোক ওই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। তা প্রায় বছর দশেক আগে। পেটে শূল বেদনা ছিল। বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ খেতে বাইরে গিয়েছিল, তখন বাথরুমে বুড়ো গলায় দড়ি দেয়। তারপর থেকে যে ভাড়াটে আসে, তারাই ভয় পায়। বেশীদিন থাকতে পারে না।

আমি বললাম — গয়ায় পিন্ডদানের ব্যবস্থা করেননি কেন?

করার চেষ্টা করেছি মশাই, অনেক বার করেছি। প্রত্যেকবার এক একটা বিঘ্ন। বুড়োর আত্মীয়রা গয়া গিয়েছিল পিন্ড দিতে, তিন দিন ধরে দারুণ ঝড়বৃষ্টি। ধর্মশালা থেকে বের হতেই পারল না।

আমি নিজে একবার গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে একমাস হাসপাতালে শয্যাগত।

পুরোহিত দিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করার চেষ্টা করেছিলাম। সেখানেও বিপত্তি।

পুরোহিত আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ভেঙে একটা চাঙর তার মাথায় পড়ল। পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

ব্যস, তারপর থেকে আর কোন পুরোহিত আসতে রাজী হলো না। কি করি বলুন তো?

সে উত্তর দিতে পারিনি। একটা কথা শুধু মনে হয়েছে। পৃথিবীর সব অবিশ্বাসী মানুষদের জড় করে চিৎকার করে বলি, যাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যায়, প্রেতযোনি বলে কিছু নেই, তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলের এই বাড়িটায় রাত কাটিয়ে যান। বাড়িটা এখনও খালি।

ঠিকানা আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। অবশ্য আমি ভাল মন্দ কোন কিছুর জন্য দায়ী থাকব না। এই মর্মে আমাকে একটা লিখিত চুক্তিপত্র দিতে হবে।

ভূতের সঙ্গে লড়াই

শেখর বসু

ডিসেম্বরের গোড়াতেই জাঁকিয়ে শীত পড়ে গেল কলকাতায়। এত শীতে বেলা পর্যন্ত লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। দুপুরের চমৎকার রোদে ক্রিকেট খেলতে ইচ্ছে করে জমিয়ে। বড় এই দুটো ইচ্ছের বাইরে আছে ছোট ছোট অগুনতি ইচ্ছে। কিন্তু এতগুলো ইচ্ছের একটাও মেটানোর উপায় নেই। আজ তো শনিবার, সামনের সোমবার থেকেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রমু আর সোমুর।

রমু পড়ে ক্লাস সিক্সে আর সোমু থ্রিতে। দুজনের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে একসঙ্গে, শেষও হবে একইসঙ্গে। সোমুর অবশ্য মধ্যিখানে কয়েকটা দিন বাড়তি ছুটি থাকলেও খেলার সুযোগ নেই একটুও। মার শাসন খুব কড়া। সারা দিন পড়ার পরে একটুখানি খেললেও গজগজ করে মা — সারা দিন শুধু খেলা আর খেলা। খেলা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, পরীক্ষার পরে যত পারিস খেলিস।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি খেলে নিলে পড়া যে কত ভাল হয় — এই কথাটা কিছুতেই বোঝান যায় না মাকে। অগত্যা চোখে জল নিয়ে দুই ভাইকেই আবার বইয়ের ওপরে ঝুঁকে পড়তে হয়।

তবে আজকের দিনটা অন্যরকম। আজ সকাল থেকেই দু-ভাইয়ের মন খুশিতে ভরে আছে। বিকেলবেলায় মা আর বাবা ঝুমা মাসীর বিয়েতে যাবে সেই ছোট জাগুলিয়ায়। এখান থেকে অনেকটা দূর, রাত্তিরে আর ফিরতে পারবে না। ফিরবে কাল সকালে।

সকাল থেকে মা দুই ছেলেকে একই কথা বলেছে বার দশেক — শোন, ঝুমুর বিয়ে বলেই যাচ্ছি। অন্য কারও হলে কিছুতেই যেতাম না এখন। তোরা

কিন্তু খুব মন দিয়ে পড়বি, একদম খেলবি না। কী রে পড়বি তো?

কথার উত্তরে রমু আর সোমু প্রতিবারই লম্বা করে মাথা কাত করেছে একপাশে। ওই মাথা নাড়া দেখলে যে কেউ ভাববে, ইস! এত বাধ্য ছেলে আর বুঝি হয় না!

আসল ব্যাপারটা ওদের মা জানে না। সকাল থেকেই দুভাই মতলব আঁটছে ফিসফিস করে। বিকেলে ব্যাডমিন্টন, সন্ধ্যেয় টেবল-টেনিস আর রাত্তিরে টিভির কুইজ। ওদের মতলবের সামনে স্কুলের বইটইগুলোকে কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছিল। ভাগ্যিস, বইরা কথা বলতে পারে না। না হলে ওদের মতলবের কথা এক্ষুণি গিয়ে মাকে লাগাত।

আজ রাত্তিরের জন্য ওদের অভিভাবক মান্তু কাকা। পাশের বাড়িতেই থাকে মান্তু কাকা। অভিভাবক হওয়ার গুরুদায়িত্ব পেয়ে মান্তু কাকা বলল, বৌদি আপনি একদম চিন্তা করবেন না, একদিনের বদলে সাতদিন থেকে আসুন। আমি আছি এ বাড়িতে, আপনার বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে একটা চোর ডাকাতও আসার সাহস পাবে না।

কথাটা বলে হাতের গুলি নাচাল মান্তু কাকা। বডিবিল্ডার মান্তু কাকার চেহারা ঠিক দৈত্যের মত, আর কী মাসল্। ক্রিকেট বলের মত হাতের গুলিটার দিকে তাকিয়ে মা হাসতে হাসতে বলল, আমি চোর তাড়াবার জন্য তোমাকে বাড়িতে থাকতে বলছি না। তুমি দেখবে শুধু ছেলে দুটো যেন পড়াশুনা করে। যা বাঁদর —।

বাঁদর বললে যে কোন মানুষেরই রাগ হবে, রমু আর সোমুরও হয়েছিল, কিন্তু ওরা রাগ দেখাল না একটুও। রাগ দেখালে মা যদি আরো রাগ দেখিয়ে বিয়ে বাড়ি যাওয়াই বন্ধ করে দেয়।

মান্তু কাকা হাসতে হাসতে বলল, আপনি একটুও ভাববেন না বৌদি। না পড়লে দুটোকে অ্যায়সা তুলে আছাড় দেব যে এ বছর আর পরীক্ষাই দিতে পারবে না।

বিকেল ঠিক সাড়ে চারটের সময় মা আর বাবা রমু আর সোমুকে আর এক দফা উপদেশ দিয়ে বিয়েবাড়িতে রওনা হয়ে গেল। রওনা হতেই প্রথম প্ল্যানটা কাজে লাগাল রমু আর সোমু।

ওরা মান্তু কাকার দু-হাত ধরে ঝুলে পড়ে বলল, মান্তু কাকা খাবে চল, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।

মান্তু কাকা খেতে ভীষণ ভালবাসে, কিন্তু একটু লাজুক লাজুক মুখ করে বলল, ন্-না, আমি খাব না। তোদের খাবারে ভাগ বসালে—।

রমু আর সোমু প্রায় একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল, ভাগ বসাবে কেন? মা তো অনেক খাবার রেখে গেছে। চাউমিন আছে, মিষ্টি আছে একগাদা।

মান্তু কাকা এবার আর আপত্তি করল না। মিনমিন করে বলল, ঠিক আছে, অল্প দিবি কিন্তু।

রমু আর সোমু তাই শুনে ছুটে গিয়ে টেবিল সাজাতে শুরু করে দিল। চাউমিন, টোম্যাটো সস আর কত রকমের মিষ্টি। খাবার থেকে খিদে বাড়িয়ে দেবার মত গন্ধ উঠছিল। দুই ভাই মান্তু কাকাকে টেনে এনে টেবিলের মধ্যিখানে চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। এত খাবার দেখে মান্তু কাকার চোখমুখ জ্বলজ্বল করছিল খুশিতে।

রমু আর সোমু একটুখানি চাউমিন মুখে দিয়েই বলল, আমাদের পেট ভরে গেছে, মান্তু কাকা তুমি খাও আমরা আসছি।

মধ্যিখানের চেয়ার থেকে কোন জবাব আসার আগেই দু-ভাই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সন্ধে গড়িয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরল রমু আর সোমু। মান্তু কাকা বসার ঘরের দরজার সামনে চেয়ার টেনে থমথমে মুখ করে বসেছিল, ওদের দেখেই গম্ভীর স্বরে বলল, কাল বাদে পরশু পরীক্ষা, আর তোরা তিন ঘন্টা ধরে খেলে এলি। তোদের মা আসুক আমি সব বলে দেব।

রমু আর সোমু আগে থেকেই জানত এই ধরণের কথার সামনে পড়তে হবে ওদের, সুতরাং লাগসই জবাব ওদের ভাবাই ছিল। সোমু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, খেললে না ভীষণ খিদে পেয়ে যায়, মান্তু কাকা স্যান্ডউইচ খাবে, চিজ স্যান্ডউইচ?

চিজ-স্যান্ডউইচের কথায় মান্তু কাকা শাসন করার কথা ভুলে গেল একদম। লাজুক লাজুক মুখে বলল, খেলাধুলো করলে খিদে তো পাবেই। আমি তো রোজ এক্সারসাইজ করি, আর এক্সারসাইজ করার পরেই যা খিদে পেয়ে যায় না! তা তোদের ভাগে কম পড়ে যাবে না তো?

না না, অনেক স্যান্ডউইচ আছে। — কথাটা বলেই সোমু ছুটল খাবার ঘরে।

আগের অত খাবার মান্তু কাকা একাই সাফ করে রেখেছিল। খালি প্লেটগুলো সরিয়ে টেবিলের ওপর চিজ-স্যান্ডউইচের ছোট্ট একটা পাহাড় বানিয়ে ফেলল সোমু। রমু নিয়ে এল কৌটো ভর্তি কাজুবাদাম আর সরেস মুড়কি।

খাবারদাবার টেবিলে সাজিয়েই দু ভাই ছোট্ট একটা শর্ত করে নিল মান্তু কাকার সঙ্গে। শর্তটা হল ঃ একটু বাদেই টিভিতে দারুণ একটা কুইজ প্রোগ্রাম আছে, ওটা দেখার পরেই আমরা পড়তে বসব। তুমি কিন্তু মাকে আমাদের খেলতে যাওয়ার কথা, টিভি দেখার কথা বলতে পারবে না।

মস্ত বড় একটা স্যান্ডউইচ একসঙ্গে মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মান্তু কাকা বলল, কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলব কীভাবে?

চটপট জবাব দিল সোমু, তোমাকে মিথ্যেও বলতে হবে না, সত্যিও না। তুমি শুধু মাকে বলবে আমরা লক্ষ্মী হয়ে ছিলাম, কী বলবে তো?

স্যান্ডউইচের শেষের দিকে একমুঠো কাজুবাদাম মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে মান্তু কাকা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখা যাবে। কই, তোরা খা।

রমু আর সোমু এবারও একটুখানি খেয়েই বলল, পেট ভরে গেছে।

এদিকে মান্তু কাকা খাব না খাব না করেও পুরো খাবারটা একাই শেষ করল। তারপর ঢকঢক করে দু গ্লাস জল খেয়ে বলল, আহ্!

সব কিছুই দু-ভাইয়ের প্ল্যান মত চলছিল, কিন্তু কপাল খারাপ, টিভি প্রোগ্রামের মাঝপথেই পাওয়ার কাট হয়ে গেল। এইরকম সময় আলো চলে যাওয়ার কোন মানে হয়।

মান্তু কাকা আড়ামোড়া ভেঙে বলল, নে নে ঢের হয়েছে, এবার হ্যারিকেন ট্যারিকেন জ্বেলে পড়তে বোস।

কথাটা যেন দু-ভাইয়ের কানেই গেল না। কুইজ দেখতে না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে হায় হায় করতে লাগল ওরা। তারপর সোমু হঠাৎই বলে বসল, মান্তু কাকা গল্প বল, ভূতের গল্প। ওর কথায় সায় দিল রমু।

মান্তু কাকা হা হা করে হেসে উঠে বলল, অন্ধকার রাত্তিরে ভূতের গল্প শুনলে তোরা ভয় পাবি।

— মোটেও না, ভূত তো আর সত্যি সত্যি নেই।

— কে বলেছে নেই, জানিস তো ছোটবেলায় ভূতের সঙ্গে আমার লড়াই হয়েছিল একবার, ওহ্! সে কী লড়াই!

খিলখিল করে হেসে উঠে রমু বলল, সেই গল্পটাই বল মান্তু কাকা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বল বল। বায়না ধরার সুরে ভাইয়ের গলায় গলা মেলাল সোমু।

আর একবার হেসে উঠে মান্তু কাকা বলল, ঠিক আছে বলছি, তবে ভয় পেতে শুরু করলেই বলবি, আমি এমনি গল্প থামিয়ে দেব।

কথার উত্তরে দু-ভাই হেসে উঠে বলল, ঠিক আছে তুমি বল।

শীতের রাত। বাইরে বোধহয় বেশ কুয়াশা পড়ছে। এক কুচিও আলো ভেসে আসছে না কোনও জায়গা থেকে। মান্তু কাকা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, এটা কিন্তু সত্যি ঘটনা। গল্পের মত শোনালেও গল্প নয়।

গল্পের ভূমিকাটুকু করতেই দু-ভাই মান্তু কাকার গা ঘেঁষে বসল। ওদের গায়ে সোয়েটার, মান্তুর গা মাথা জড়ান চাদরে। আশেপাশের বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ বলেই বোধহয় কোনরকম শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

মান্তু কাকা শুরু করল তার সত্যি ঘটনা — আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। থাকতাম বেলেঘাটায়। ওখানে তখন আজকের মত এত লোকজন ছিল না। আমাদের পাড়া ছিল আরও ফাঁকা। জানিস তো ছোটবেলায় আমি খুব ডানপিটে ছিলাম। ভয় কাকে বলে জানতাম না। এক্সারসাইজ করতাম, কুস্তি লড়তাম, বক্সিং লড়তাম। আমাদের পাড়ার কাছেই ছিল রামসেবক সঙ্ঘ। রোজ বিকেলে ওখানে আমি এক্সারসাইজ করতাম। সেদিন এক্সারসাইজ করতে করতে বেশ মেজাজ এসে গিয়েছিল। ভাবলাম অনেকক্ষণ ধরে ওয়েটলিফট করব। সন্ধ্যে হতে না হতেই ক্লাবের মেম্বাররা এক এক করে চলে গেল। ক্লাবে আমি একা। আমাদের ক্লাবের ছাদ ছিল না, চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাশেই বিরাট একটা বটগাছ। বটগাছের ডালপালা ক্লাবের যেদিকে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকে বেশ অন্ধকার। হঠাৎ ওই অন্ধকার থেকে কে যেন নাকিসুরে বলল, কী রে খুব তো এক্সারসাইজ করছিস, পারবি আমার সঙ্গে। — আমি তো অবাক। কে ওখানে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি কুচকুচে কালো, রোগা, হাড্ডিসার একটা ছেলে। ধমকে বললাম, এই তুই এখানে কী করছিস রে? যা ভাগ। ছেলেটা তার জবাবে বলল, এক্সারসাইজ করে খুব তো জোর বাড়াচ্ছ গায়ে, পারবে আমার সঙ্গে লড়াই করতে? রোগা লিকলিকে ছেলেটার আস্পদ্দা দেখে রাগে আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। বললাম, দাঁড়া তোকে পাঁচিলের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।

— তারপর? থমথমে গলায় প্রশ্ন করল সোমু।

আর একবার কেশে নিয়ে মান্তু কাকা বলল, তারপর আবার কি, শুরু হয়ে গেল লড়াই। অত লিকলিকে চেহারা, কিন্তু ওকে জাপটে মাথার ওপরে তুলতে

গিয়েই টের পেলাম ওর গায়ে অসুরের মত শক্তি।

— আচ্ছা, কার গায়ে বেশি শক্তি মাস্তু কাকা, ভূতের না অসুরের?

রমুর প্রশ্নের জবাবে বিরক্ত হয়ে মাস্তু কাকা বলল, শোন না আগে। অসম্ভব জোর লিকলিকে ছেলেটার গায়ে। অত জোর দেখেই আমার সন্দেহ হল — এ নির্ঘাত ভূত। গাছের নিচেটা অন্ধকার-অন্ধকার, ওই অন্ধকারে আমার ছায়া পড়ছে কিন্তু ছেলেটার কোন ছায়া নেই। ভূতদের তো ছায়া পড়ে না। ও যে ভূত সে ব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহই থাকল না। কিন্তু তখন যদি লড়াই ছেড়ে পালাতে যাই, ও নির্ঘাৎ আমার ঘাড় মটকে দেবে। শুনেছি, মানুষ ভয় পেয়েছে জানলে ভূতদের গায়ের জোর অনেক বেড়ে যায়। সেই জন্যে ভয় পাওয়ার কথা ভূতটাকে জানতে না দিয়ে ওর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলাম আমি।

— সত্যি-সত্যি লড়াই?

সত্যি-সত্যি লড়াই না তো কী। বললাম না এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। লড়াই বলে লড়াই, ওরকম লড়াই কোথাও দেখা যায় না। একবার আমি ওকে আছাড় মারি, একবার ও আমাকে আছাড় মারে। শুধু কুস্তির প্যাঁচই নয়, ওই সঙ্গে বক্সিংও চালাতে লাগলাম আমি। ভূতটা বক্সিং জানত না, বক্সিংয়ের জবাবে ও কিল মারতে লাগল। ভূতের কিল যে একবার খেয়েছে সেই জানে ওই কিলের কী জোর! ওখানে আমার জায়গায় আর কেউ থাকলে তাকে আর বেঁচে ফিরতে হত না। তা, আমি ঠিক করলাম, লড়াই করতে করতে ওকে আমি ক্লাবের ভেতর দিকে এনে ফেলব। ভেতরদিকে একবার এনে ফেলতে পারলে আমার আর কোন ভয় নেই।

— কেন কেন? দু-ভাইই প্রশ্ন করল একসঙ্গে।

ক্লাবের ভেতরদিকে মহাবীরের সিঁদুর মাখানো মূর্তি ছিল। মহাবীর তো ভগবান, ভগবানের সামনে ভূত কি দাঁড়াতে পারে? সেই মতলবে গায়ের সব শক্তি জড়ো করে মারলাম এক জব্বর প্যাঁচ, আর সেই প্যাঁচেই ভূতটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মহাবীরের মূর্তির ঠিক সামনে, ব্যাস।—

— ব্যাস কী?

— ব্যাস, ভূতটা বাঁবাগো মাঁগো বলে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ভূতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ওই লড়াইয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে অত শীতের রাতেও উত্তেজনায় দুই ভাইয়ের গা ঘেমে উঠেছিল।

গল্পের শেষে হ্যারিকেন জ্বালান হল, আর তারপরেই শোনা গেল রাস্তার

মোড়ের ট্রান্সফর্মারটা পুড়ে গেছে, সুতরাং আজ রাতে আলো আসার আর সম্ভাবনা নেই।

হ্যারিকেনের আলোয় বেশিক্ষণ বোধহয় রাত জেগে থাকা যায় না, ভাত খাওয়ার পরেই তাই ঘুমে চোখ ভেঙে এল দু-ভাইয়ের। রমু বলল, মাস্তু কাকা আমরা এখন ঘুমিয়ে পড়ছি, কাল খুব ভোরে উঠে পড়তে বসব।

হাসতে হাসতে জবাব দিল মাস্তু কাকা — ঠিক হ্যায়।

রমু, সোমু শোবে এ ঘরে, মাস্তু ও ঘরে।

ঘরের দরজা দেবার আগে রমু বলল, মাস্তু কাকা ওই ভূতটা তোমাকে আর তাড়া করেনি কখনো?

গুণগুণ করে গান গাইছিল মাস্তু কাকা, গান থামিয়ে জবাব দিল, না, ওই ঘটনার পরে ক্লাবটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর ভূতটা তো ওই বটগাছ ছেড়ে আর কোথাও যেত না।

— কেন?

— বাহ্ জানিস না, অপঘাতে মরার পরে কেউ ভূত হলে সে মরার জায়গাটা ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না। আমি ওই বটগাছের কাছেও আর যেতাম না, ব্যস মিটে গেল সব।

— আহা তাই আবার হয় নাকি?

মাস্তু কাকা গম্ভীরভাবে বলল, আমার কাছ থেকে শুনে রাখ — তাই হয়।

রমুর চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ — তাই হলে তো ও ঘরে নায়ারের ভূত থাকার কথা।

— নায়ার কে?

— আমরা এই ফ্ল্যাটে আসার আগে নায়াররা এখানে ভাড়া থাকত। ভদ্রলোক ও ঘরে খাট থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল। কথাটা বলতে বলতে লম্বা করে হাই তুলল রমু। তারপর শুয়ে পড়ছি বলেই দরজায় খিল দিয়ে দিল।

দু-ভাই এ ঘরে দুটো সিঙ্গল খাটে ঘুমোয়। বিছানায় পড়া মাত্তর দু-ভাইই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেনি, দরজায় দুমদুম শব্দ। দরজার ওপাশে মাস্তু কাকার গলা — এই দরজা খোল, দরজা খোল, ও রমু ও সোমু।

দরজা ধাক্কার শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দরজা খুলতেই মাস্তু

কাকা কেমন যেন ছিটকে ঘরে ঢুকে পড়ে বলল, আমি এ ঘরে শোব। ও ঘরে নায়ার, ও ঘরে নায়ারের ভূত।

এ ঘরে ছোট দুটো সিঙ্গল খাট। মাস্তু কাকা দুটো খাটের মাঝখানের মেঝেয় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে মাস্তু কাকা লাজুক মুখে বলল, ভূতে আমার ভয় নেই, তবে ওই নায়ারের ভূতটা কাল রাতে ঝড়ের মত মালয়ালমে কী যে বলছিল কে জানে। তোরাই বল, ভাষা না বুঝলে কি লড়াই করে সুখ আছে। তাই রাগ করে আমি এ ঘরে চলে এসেছিলাম। তোরা কিন্তু এই ব্যাপারটা কাউকে বলবি না। না বললে তোদের দুটো ক্রিকেট বল আর এক ডজন শাটল কক্ কিনে দেব।

বেলা আর একটু বাড়তেই রমু সোমুর মা, বাবা ফিরে এল বাড়িতে। আর ফিরতেই মাস্তু কাকা বলল, বৌদি, ওরা একটুও দুষ্টুমি করেনি, ভীষণ লক্ষ্মী হয়ে ছিল। আর পড়ায় কী মন। কতবার বলেছি যা একটু খেলে আয়, কিন্তু —।

ওকে থামিয়ে দিয়ে রমু সোমুর মা বলল, থাক থাক ওদের আর অত গুণকীর্তন করতে হবে না।

মা বাবার সামনে দাঁড়িয়ে রমু আর সোমু মিটিমিটি হাসছিল।

ভয়ঙ্কর
ভূতের গল্প